# ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি
# সমস্যা ও সমাধান


মূল

**শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী**

জগদ্বিখ্যাত আলেমে দ্বীন, দাঈ, বহু কালজয়ী গ্রন্থের রচয়ীতা
ভাইস প্রেসিডেন্ট : ইসলামী ফিকহ্ একাডেমী, জেদ্দা, সৌদী আরব
শাইখুল হাদীস ও নায়েবে মুহতামিম : দারুল উলূম, করাচী

অনুবাদ

**মুফতী মুহাম্মাদ জাবের হোসাইন**

শিক্ষক, জামিআ কারীমিয়া আরাবিয়া, রামপুরা, ঢাকা


মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

## প্রকাশকের কথা

জগত বিখ্যাত আলেমে দ্বীন, যাঁর ইলমী ব্যক্তিত্বের ফয়েয ও বরকত হতে সমকালীন পাক ভারত ও বাংলা উপমহাদেশের সচেতন কোন আলেমই বঞ্চিত নয়, বরং সত্যিকথা হলো, সমগ্র দুনিয়ার মুসলিম জাতিই কোন না কোনভাবে তাঁর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। তিনি হলেন হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী (দামাত বারাকাতুহুম)

১৯৯৪ ঈসায়ীর জানুয়ারী মাসে করাচীর দারুল উলূমে অনুষ্ঠিত পনের দিন ব্যাপী اسلام اور جدید معیشت وتجارت (ইসলাম ও আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থব্যবস্থা) শীর্ষক কোর্সে অংশ গ্রহণের পূর্বে হযরতওয়ালা সম্পর্কে আমার ধারনা ছিল তিনি হাদীস ও ফিক্হ সম্পর্কে অভিজ্ঞ একজন ব্যক্তি। কিন্তু উপরোক্ত কোর্সে অংশ গ্রহণ করার পর আমার মনে হলো, ছোট শিশু যেমন তার দুর্বল দৃষ্টির শেষ সীমাকে জমিন ও আসমানের শেষ 'ডডসীমা মনে করে ভাবে- সমগ্র পৃথিবীর পরিধি এতটুকুই। আমিও হযরত সম্পর্কে সেইরূপ সংকীর্ণ ধারনারই শিকার ছিলাম। কোর্স শেষে মনে হলো, আল্লাহপাক ইলমে দ্বীনের সাথে সাথে দুনিয়ায় প্রচলিত সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কেও হযরতকে পূর্ণাঙ্গ ধারনা দান করে সেগুলোর ভেতরে লুকিয়ে থাকা কুফর, শিরক ও ধোঁকা-প্রতারণার মুখোশ উম্মোচন করে তদস্থলে ইসলামের সাম্য ও শান্তির বিধানের উপযুক্ততা প্রমাণ ও তার বাস্তব প্রতিষ্ঠার সংস্কারমূলক খেদমত নেওয়ার ব্যবস্থা হযরতের মাধ্যমে করেছেন। আল্লাহপাক হযরতের ছায়াকে আমাদের উপর দীর্ঘায়িত করুন। আমীন।

ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি একেবারে দৃষ্টিকটুভাবেই ধরা পড়ে। একশ্রেনীর লোক যারা বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শরয়ী বোর্ডের সদস্য, তারা যেন অনেকাংশে সে সকল প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের মডেল। তাদের দেওয়া দিক নিদের্শনার বাস্তবায়নে পরিচালনা বোর্ড বাধ্য নয়, বিধায় অনেক ক্ষেত্রেই তাদের পরামর্শগুলো ফাইলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে কিন্তু বাস্তবতার মুখ দেখতে সক্ষম হয় না।

অপর একটি শ্রেনী ঢালাওভাবে ইসলামী ব্যাংকসমূহকে অন্যান্য সুদী

ব্যাংকের চেয়েও খারাপ আখ্যা দিয়ে থাকে। অথচ দুটি গ্রুপই বাড়াবাড়ির শিকার। আসল কথা হলো, ইসলামী ব্যাংক ও অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানের সকল কর্ম-কাণ্ড যেমন ইসলাম বিরোধী নয় তদ্রূপ তাদের সকল লেন-দেন কাজ-কারবার ইসলাম সম্মতও নয়।

আমাদের বক্ষমান গ্রন্থ "ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতিঃ সমস্যা ও সমাধান" পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকিংয়ের স্বপ্নদ্রষ্টা ও এ যুগের ইসলামী অর্থনীতি ও বাণিজ্য নীতির মুজাদ্দিদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমের ইংরেজী রচনা ISLAMIC FINANCE যার উর্দূ তরজমা اسلامی بنکاری کی بنیادیں -এর অনুবাদ। বইটি পাঠ করলে এ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ হবে এবং সকলে উপরোক্ত ভুল বুঝাবুঝি ও বাড়াবাড়ির হাত থেকে রেহাই পেয়ে নিজেদের সংশোধন করার সুযোগ পাবেন ইনশা আল্লাহ্।

অনুবাদক মুফতী মুহাম্মাদ জাবের হোসাইন যদিও অনুবাদ জগতে নবীন কিন্তু তার অনুবাদ কোন কোন প্রবীণ অনুবাদকের চেয়েও বলিষ্ঠ, সাবলিল ও যথার্থ। আল্লাহ্ পাক তাঁকে এ জাতীয় খেদমতের জন্য কবুল করুন। আমীন।

আমরা বইটির বিষয় বস্তু ও প্রয়োজনীয়তার দিক লক্ষ্য করে সেভাবেই এর সম্পাদনা ও অঙ্গসজ্জার ব্যবস্থা নিয়েছি। এক্ষেত্রে আমাদের মুখলিস বন্ধুবর জনাব শামছুল আরেফীন খালেদ অতি ব্যস্ততা সত্ত্বেও বইটি আদ্যো প্রান্ত দেখে সংশোধন করে দিয়েছেন। আল্লাহ্পাক তাকে জাযায়ে খাইর দান করুন। আমীন।

আমরা আমাদের সাধ্য মত বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো দৃষ্টিতে কোন ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়ে, তাহলে আমাদের অবগত করলে পরবর্তি সংস্করনে সংশোধন করে দিবো– ইনশাআল্লাহ। আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে ইসলামী শরী'অত মুতাবিক ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং ও অর্থায়ন করে রিযিক হালাল রাখার তাওফীক দান করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

তারিখ ঃ ২৪শে শাবান ১৪২৬ হিজরী
২৮শে সেপ্টম্বর ২০০5 ঈসায়ী

বিনীত
**মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান**
আজীমপুর, ঢাকা

## অনুবাদকের কথা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ইসলামী বিধি-বিধান কোন প্রকার ধোঁকা, প্রতারণা, প্রতিশোধ কিংবা প্রতিক্রিয়া ভিত্তিক নয়। বরং নাম ও তাৎপর্যগত উভয়দিক থেকেই ইসলাম মানব সমাজের জন্য একটি কল্যাণকর সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা। মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক প্রয়োজনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের রয়েছে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক আদর্শ। তাই তার অর্থায়ন পদ্ধতিতেও নিন্দিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যেমন অবকাশ নেই তদ্রূপ সমাজতন্ত্রের শোষনমূলক অর্থব্যবস্থারও কোন স্থান নেই। ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতির আদর্শিক রূপ হচ্ছে মুশারাকা এবং মুদারাবা। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মুরাবাহা, ইজারা, সালাম এবং ইসতিসনা পদ্ধতিতেও সমকালীন বিদগ্ধ গবেষক আলিমগণ অর্থায়নের অনুমতি দিয়েছেন।

ইসলামী অর্থায়নে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে পারস্পারিক সহযোগিতা। আর বর্তমানে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা হচ্ছে আধুনিক যুগের পারস্পারিক অর্থায়ন সহযোগিতার উন্নত পদ্ধতি। ইসলাম পারস্পারিক সহযোগিতামূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মতৎপরতাকে অবৈধ করেনি।

সুদের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হয়ে যেসব আর্থিক প্রতিষ্ঠান বৈধ ও সুষ্ঠু পদ্ধতিতে নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আত্মনিয়োগ করে ইসলাম তাকে উৎসাহিত করে। ব্যাংক নিশ্চয়ই কল্যাণকর ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বর্তমান প্রচলিত সূদভীত্তিক ব্যাংক হলো পুঁজিপতিদের জন্য, গরীবদের জন্য নয়। কারণ এটা হলো সম্পদ বাড়ানোর ও সম্পদশালীদের স্বার্থ রক্ষার প্রতিষ্ঠান এবং গরীবদের শবদেহের উপর পুঁজির গগনচুম্বি অট্টালিকা তৈরি করার উত্তম হাতিয়ার। তবে অর্থায়ন পদ্ধতির যে চিত্র ইসলাম পেশ করেছে তা পৃথিবীতে যদি বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করে সমাজের পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে।

সুদবিহীন ব্যাংক এক সময় ছিল অকল্পনীয় এখন তা বাস্তব। পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা সঠিক হলে সুদী ব্যাংক থেকে ইসলামী ব্যাংক অধিকতর সফল।

বাংলা ভাষায় ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রামাণ্য গ্রন্থের

একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও ইসলামী ব্যাংকিংয়ের রূপকার জাষ্টিজ ও যুগ সচেতন মুফতী শাইখুল ইসলাম আল্লামা ত্বাকী উসমানী রচিত 'ইসলামিক ফাইন্যান্স' শীর্ষক ইংরেজী ভাষার গবেষনামূলক গ্রন্থ যুগ সচেতন ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও উলামায়ে কেরামের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। উর্দূভাষীদের সুবিধার্থে পাকিস্তানের মাওলানা মুহাম্মাদ যাহিদ 'ইসলামী ব্যাংকারী কী বুনিয়াদে' নামে গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় রূপান্তরিত করেন। 'ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি সমস্যা ও সমাধান' তারই বাংলা অনুবাদ। গ্রন্থকার তার এ গ্রন্থে ইসলামী অর্থায়ন সম্পর্কিত মৌলনীতিসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিভিন্ন প্রশ্ন ও সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করে এ গ্রন্থের মাধ্যমে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন।

গ্রন্থটি অনুবাদের জন্য শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মুফতী মীযানুর রহমান ছাহেব আমার হাতে তুলে দেন। অনুবাদ শেষে মাকতাবাতুল আশরাফের স্বাত্বাধিকারী বন্ধুবর মুফতী হাবীবুর রহমান খানকে পান্ডুলিপিটি দেখালে তিনি আগ্রহের সাথে তা প্রকাশের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। গ্রন্থটি নির্ভূল অনুবাদে চেষ্টার ত্রুটি করিনি। এরপরও জ্ঞানের অপরিপক্কতার কারণে ভুলভ্রান্তি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। বিজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টিতে কোন ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করনে তা সংশোধন করে দেয়ার প্রত্যাশা ও অঙ্গীকার রইল। পাঠক-পাঠিকাগণ গ্রন্থটি দ্বারা সামান্য উপকৃত হলেও আমি আমার দীর্ঘ শ্রমকে সার্থক মনে করবো। উস্তাদে মুহতারাম যিনি গ্রন্থটি অনুবাদের জন্য হাতে তুলে দিয়েছেন এবং যিনি প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আরো যারা বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ্ তাআলা সকলকে স্বীয় ভূমিকা অনুযায়ী সর্বোচ্চ বিনিময় দান করুন। পরিশেষে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে বিনীত প্রার্থনা, তিনি যেন গ্রন্থটি কবুল করেন এবং তা থেকে পাঠক মন্ডলীকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন! ছুম্মা আমীন!!

তারিখঃ- ১৪.০৬.২০০৫ইং

মুহাম্মাদ জাবের হোসাইন
জামিয়া কারীমিয়া আরাবিয়া
রামপুরা-ঢাকা।

# সূচী পত্র

بسم الله الرحمنرحيم

# ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ، وَعَلٰى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ. اَمَّا بَعْدُ :

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি জগৎসমূহের মালিক। দরূদ ও সালাম তাঁর প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবার পরিজন, সাহাবায়ে কিরাম ও ক্বিয়ামত পর্যন্ত যাঁরা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবেন তাঁদের প্রতি।

বিগত কয়েক দশক যাবৎ মুসলমানগণ তাঁদের জীবনকে ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে নতুন করে বিনির্মাণের প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। মুসলমানগণ প্রচন্ড ভাবে এ কথা অনুধাবন করতে পেরেছে যে, বিগত কয়েক শতাব্দী যাবৎ পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আগ্রাসন তাদেরকে বিশেষভাবে আর্থ-সামাজিক (Socio-Economic) ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন-ব্যবস্থার উপর আমল করা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। ফলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম জনগণ তাদের জীবনকে ইসলামী শিক্ষার আলোকে সাজানোর লক্ষ্যে নিজেদের ইসলামী স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তাকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

অর্থনৈতিক অঙ্গনে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে শরীয়াহ মুতাবেক পরিচালনা করার লক্ষ্যে সেগুলোতে সংস্কার সাধন করা মুসলমানদের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। বিশেষত এমন এক পরিবেশে যার গোটা অর্থ ব্যবস্থা সুদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে সে পরিবেশে আর্থিক

প্রতিষ্ঠানসমূহকে সূদ বিহীন (Interest-Free) ভিত্তির উপর পুনর্গঠন করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ।

যেসব লোক শরীয়তের মূলনীতি, আদর্শ এবং তার অর্থনৈতিক দর্শন সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল নন, তারা কখনও কখনও মনে করে থাকেন যে, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সুদমুক্ত করলে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো আর ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থাকবে না বরং সেগুলো সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে রূপারিত রূপান্তরিত হয়ে যাবে। যার উদ্দেশ্য হবে বিনা লাভে আর্থিক সেবা (Financial Service) প্রদান করা।

প্রকৃতপক্ষে এ ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। শরীয়তের দৃষ্টিতে সুদবিহীন ঋণ একটি নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলের জন্য; ব্যাপকভাবে ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য নয়। বরং তা পারস্পারিক সহযোগিতা এবং কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডের জন্য হয়ে থাকে। তবে যেখানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পুঁজি সরবরাহের (Commercial Financing) প্রশ্ন জড়িত সেখানে ইসলামী শরীয়তের নিজস্ব এক স্বয়ংসম্পূর্ণ দিক নির্দেশনা (Set-up) বা নীতিমালা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি হলো, যে ব্যক্তি অপরকে ঋণ প্রদান করছেন তাকে প্রথমে এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তিনি কি এ ঋণ দ্বারা শুধু দ্বিতীয় পক্ষকে সাহায্য করতে চান, নাকি তার মুনাফায় অংশীদার হতে চান? যদি তিনি এ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতাকে কেবল সাহায্য করতে চান তাহলে ঋণগ্রহীতা থেকে ঋণের পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত দাবী করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তার মূল পুঁজি নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকবে (অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষের ক্ষতি বা লোকসান হলেও ঋণদাতার মূলধন ফেরৎ পাওয়ার অধিকার সংরক্ষিত থাকবে)। কিন্তু মূল পুঁজির অতিরিক্ত কোন মুনাফার হকদার তিনি হবেন না। আর তিনি যদি অন্যকে এই উদ্দেশ্যে পুঁজি সরবরাহ করেন যে, তার ব্যবসায় অর্জিত মুনাফায় অংশ নিবেন এমতাবস্থায় তিনি অর্জিত মুনাফায় পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আনুপাতিক হারে মুনাফা দাবী করতে পারবেন। তবে, এ ক্ষেত্রে যদি লোকসান হয়ে যায় তাহলে তাকে উক্ত লোকসানেরও দায় বহন করতে হবে।



সুতরাং এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে সুদের পরিসমাপ্তির অর্থ এই নয় যে, পুঁজির যোগানদাতা (Financier) কোন মুনাফা অর্জন করতে পারবে না। বরং যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে পুঁজির যোগান দেওয়া হয়, তাহলে লাভ- লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এ লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। এ জন্যই ইসলামী বাণিজ্য আইনের শুরুতেই মুশারাকা এবং মুদারাবা পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে।

তবে এমন কিছু ক্ষেত্র আছে যে সকল ক্ষেত্রে কোনভাবেই মুশারাকা এবং মুদারাবা পদ্ধতিতে অর্থায়ন করা যায় না, সেসব ক্ষেত্রে অর্থায়নের জন্য সমকালীন আলিমগণ অন্যান্য কিছু প্রক্রিয়াও উদ্ভাবন করেছেন, যেগুলো অর্থায়নের লক্ষ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন- মুরাবাহা, ইজারা, সালাম এবং ইসতিসনা’।

বিগত দু’দশক যাবৎ ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে অর্থায়নের ইসলামী পদ্ধতিসমূহ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে তা পরিপূর্ণভাবে সুদী অর্থায়নের বিকল্প নয়। আবার এ ধারনাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে, ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতিসমূহ হুবহু সুদী অর্থায়ন পদ্ধতির ন্যায় ব্যবহার করা যায়। বরং ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতিসমূহের রয়েছে নিজস্ব মূলনীতি, দর্শন এবং শর্তাবলী। যেগুলো ব্যতীত সে পদ্ধতিসমূহকে শরীয়তের দৃষ্টিতে অর্থায়ন পদ্ধতি (Modes of Financing) হিসেবে ব্যবহার করা বৈধ হবে না। সুতরাং এ পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে মৌলিক ধারণার অভাব এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞতা ইসলামী অর্থায়নকে সুদভিত্তিক প্রচলিত অর্থায়নের সাথে খলত-মলত ও জগাখিচুড়ি করে ফেলার কারণ হয়ে যেতে পারে।

আমার বক্ষমান এ গ্রন্থটি বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত। যার উদ্দেশ্য ইসলামী অর্থায়নের মূলনীতি এবং তার নিয়মাবলী সম্পর্কে মৌলিক ধারণা দেয়া। বিশেষ করে অর্থায়নের যে পদ্ধতিসমূহ ইসলামী ব্যাংক এবং অন্যান্য নন-ব্যাংকিং অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান (Non-Banking Financial Institutions)-এ ব্যবহৃত হচ্ছে সেসব অর্থায়ন পদ্ধতির গভীরে বিদ্যমান মূলনীতিসমূহ শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণীয় হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী এবং সেগুলো

বাস্তবায়নের পদ্ধতিসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করার প্রয়াস পেয়েছি। সাথে সাথে ঐ পদ্ধতিসমূহ বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে উদ্ভুত বাস্তব সমস্যাবলী এবং শরীয়তের আলোকে সেগুলোর সম্ভাব্য সমাধানের উপরও আলোকপাত করেছি।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কয়েকটি ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ সুপারভাইজারী বোর্ডের সদস্য বা চেয়ারম্যান হওয়ার সুবাদে আমার কাছে তাদের কর্মপদ্ধতি যথেষ্ট দুর্বল হিসেবে পরিলক্ষিত হয়েছে। যার মৌলিক কারণ হল, শরীয়তের সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী সম্পর্কিত মূলনীতি ও নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকা। এ বাস্তব অভিজ্ঞতা বক্ষমান গ্রন্থটি পাঠকদের খেদমতে উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয়তার অনুভূতিকে শাণিত করেছে। গ্রন্থটিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর আমি সহজবোধ্য ও সাবলীলভাবে আলোকপাত করেছি যেন সাধারণ পাঠকবৃন্দ- যাদের ইসলামী অর্থায়নের নীতিমালা গভীরভাবে অধ্যয়নের সুযোগ হয়নি তারাও সহজে অনুধাবন করতে পারেন।

আশাকরি আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ইসলামী অর্থায়নের নীতিমালা এবং ইসলামী ব্যাংকিং ও প্রচলিত ব্যাংকিং-এর্ মধ্যকার পার্থক্য সহজভাবে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার দরবারে বিনীত প্রার্থনা, তিনি যেন গ্রন্থটি কবুল করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের ওসীলা বানিয়ে দেন এবং তা থেকে পাঠকমণ্ডলীকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করেন। ওয়ামা তাওফীক্বী ইল্লা বিল্লাহ।

মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
করাচী, পাকিস্তান
০৪.০৩.১৪১৯ হিজরী
২৯.০৬.১৯৯৮ ঈসায়ী

# কয়েকটি মৌলিক সূক্ষ্ম বিষয়

ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি সমূহ (Modes of Financing) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কিত কয়েকটি সূক্ষ্ম বিষয়কে সুস্পষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন মনে করি, যে বিষয়সমূহ ইসলামী জীবন বিধানের গোটা অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে।

## (১) আসমানী হেদায়াতের উপর বিশ্বাস স্থাপন

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাথমিক অত্যাবশ্যকীয় আক্বীদা, যাকে কেন্দ্রে করে সকল ইসলামী ভাবধারা গড়ে ওঠে তা হলো এ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা এবং তা তাঁর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি বানিয়েছেন। যেন তারা আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান পালনের মাধ্যমে বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ পূর্ণ করে। আল্লাহ তা'আলার এই বিধানাবলী এবং ইবাদাতসমূহ কিছু ধর্মীয় রসম-রেওয়াজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা আমাদের জীবনের প্রায় প্রতিটি বিষয়ের এক বিরাট অংশ জুড়ে আবর্তিত। ঐ বিধানাবলীতে খুঁটিনাটি ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে এত চুলচেরা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেন নি যে, এর ফলে মানবিক কর্মকাণ্ড একটি সংকীর্ণ গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ হয়ে যায় এবং মানুষের চিন্তা-ভাবনার কোন অবকাশই অবশিষ্ট না থাকে। আবার এ বিধানাবলী এত সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্টও রাখেন নি যে, জীবনের প্রতিটি অধ্যায় মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। বরং এ উভয় প্রান্তসীমা থেকে দূরে অবস্থান করে ইসলাম মানব জীবন-ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান উপস্থাপন করেছে। ইসলাম একদিকে যেমন মানবিক কর্মকাণ্ডের একটি বড় অংশ মানুষের স্বীয় বিবেক-বুদ্ধির সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দিয়েছে। যেখানে সে স্বীয় চিন্তা-ভাবনা, মাছলিহাত ও বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে

নিজেই ফয়সালা করতে পারে।[১] অপরদিকে ইসলাম মানুষের কর্মকাণ্ডকে এমন কতগুলো মূলনীতির অধীনে রেখেছে, যেগুলো সকল যুগে প্রযোজ্য। মানুষের ধারনা প্রসূত কল্যাণের অপরিপক্ক দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ প্রদত্ত এসব নিয়মনীতির বিরুদ্ধাচরণ করা যাবে না।

অবস্থার আল্লাহ প্রদত্ত বিধানাবলীর এ ধারণার পিছনে কার্যকর মূল রহস্য এই যে, মানুষের বিবেক-বুদ্ধি যথেষ্ট পূর্ণতা সত্ত্বেও সত্যে উপনীত হওয়ার ব্যাপারে সীমাহীন শক্তির দাবী করতে পারে না। তার কর্মকাণ্ডেরও শেষ পর্যন্ত একটি পরিধি রয়েছে, যে পরিধির বাইরে সে সঠিকভাবে কাজ সম্পাদন করতে পারে না। অথবা ভ্রান্তির শিকারে পরিণত হয়। মানুষের জীবনের এমন কিছু অধ্যায় রয়েছে, যেখানে বিবেক-বুদ্ধি সাধারণত দ্বিধান্বিত হয়ে যায় এবং যৌক্তিক দলীল প্রমাণের ছদ্মাবরণে অসুস্থ প্রবণতা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে অগঠনতান্ত্রিক এবং ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য করে। অতীতের সে সকল মতবাদ যেগুলোকে বর্তমানে ভ্রান্ত বিভ্রান্তিকর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, ঐ সকল মতবাদ সম্পর্কে সে যুগে দাবী করা হয়েছিল, যে তা যৌক্তিক দলীল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু শতবর্ষ পর এর ভ্রান্তি প্রকাশিত হয়েছে এবং সেগুলোকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে হাস্যকর ও অর্থহীন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এতে প্রমাণিত হল যে, বিবেক-বুদ্ধির স্রষ্টা স্বয়ং একে কার্যক্ষমতার যে পরিধি দান করেছেন, তা সীমাহীন নয়। কিছু এমন ক্ষেত্রও রয়েছে, যেথায় মনুষ্য বুদ্ধি যথার্থভাবে পথ প্রদর্শন করতে পারে না, অথবা কমপক্ষে পথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ভ্রান্তিতে নিপতিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা অবশ্যই থেকে যায়। সেসব ক্ষেত্রে বিশ্বজাহানের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীগণের উপর ওহী নাযিল করে মানব জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। এ কারণেই প্রত্যেক মুসলিমের দৃঢ় আক্বীদা ও বিশ্বাস হলো, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি ওহী নাযিল করে আমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন, তার বাহ্যিক এবং আধ্যাত্মিক (In-letter and Sprit) উভয় ধরনের বাস্তবায়ন হওয়া উচিত। কারো

১. শরীয়তের পরিভাষায় এটাকে মুবাহ বলা হয়, যা করা না করা কোনটার ব্যাপারেই শরীয়তের দৃষ্টিতে মানুষের জন্য অপরিহার্য নয়।



বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা বা ব্যক্তিগত অভিলাষের ভিত্তিতে সে সকল হিদায়াতকে উপেক্ষা বা সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করা যাবে না। এ কারণে সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহ প্রদত্ত সে সকল বিধানাবলীর অধীনে থেকে তাতে বর্ণিত সীমারেখা ও নিয়ম-নীতির ভিত্তিতেই পরিচালিত হতে হবে। ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মতো কতেক সাধারণ চারিত্রিক শিক্ষা, রসম-রেওয়ায বা কিছু ইবাদতে সীমাবদ্ধ নয়। বরং ইসলাম জীবনের সকল ক্ষেত্রে শিক্ষা-দীক্ষা এবং দিক নির্দেশনা দিয়েছে, যার মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভাগও অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর বান্দাদের শুধু ইবাদাত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের নির্দেশ পালন করতে বলা হয়নি। বরং নিজেদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও তাঁর নির্দেশ পালন অত্যাবশ্যক করেছেন। চাই তা বাহ্যিক কিছু লাভ ত্যাগ করার বিনিময়েই হোক না কেন। কারণ এ সকল বাহ্যিক লাভ সমাজের সমষ্টিগত লাভের পরিপন্থি।

## (২) পুঁজিবাদ ও ইসলামী অর্থ -ব্যবস্থার মাঝে মৌলিক পার্থক্য

ইসলাম বাজারের শক্তি (চাহিদা ও যোগান) এবং বাজার অর্থনীতিকে অস্বীকার করে না। এমনকি ব্যক্তি স্বার্থের চেতনাও একটি যৌক্তিক সীমা পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য। ইসলাম ব্যক্তি মালিকানাকেও সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেনি। এতদসত্ত্বেও ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার মাঝে মৌলিক পার্থক্য হল, পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তি-মালিকানা এবং ব্যক্তি-স্বার্থের চেতনাকে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে লাগামহীন শক্তি এবং সীমাহীন স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এবং তাদের এ স্বাধীনতাকে কোন ধরনের ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি। যদি কোথাও কিছু নিয়ন্ত্রণ থেকেও থাকে তাও স্বয়ং মানুষ কর্তৃক আরোপিত। যা আইন তৈরির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবর্তনের সম্ভাবনা মুক্ত। আর এ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণের ঊর্ধ্বে কারো কর্তৃত্বকে (Authority) স্বীকার করে না। এরূপ ব্যবস্থা এমন বহু কার্যকলাপের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, যা সমাজে (অর্থনৈতিক) বৈষম্য সৃষ্টির কারণ হয়ে যায়। সুদ, জুয়া এবং লটারী সম্পদকে গুটিকতেক লোকের হাতে পুঞ্জিভূত করে রাখার সুযোগ করে দেয়। অর্থোপার্জনের লক্ষ্যে অশালীন ও ক্ষতিকর দ্রব্য এবং সেবা (Service) আবিষ্কারের মাধ্যমে অসুস্থ মনুষ্য আবেগকে ব্যবহার করা হয়।

ধন-সম্পদ উপার্জনের লাগামহীন আগ্রহ ও স্পৃহা ইজারাদারী সৃষ্টি করে। ফলে বাজারের ক্ষমতা (চাহিদা ও যোগান) হয়ত স্থবির ও শ্লথ হয়ে যায়। অথবা কমপক্ষে তার স্বাভাবিক কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যা বাজার-ক্ষমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে দাবীদার, কার্যত চাহিদা ও যোগানের স্বাভাবিক নিয়মে তা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কেননা, চাহিদা ও যোগানের এ শক্তি ইজারাদারীতে নয় বরং উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার অঙ্গনে সঠিকভাবে কাজ করে। ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় (Secular Capitalism) অনেক সময় এমনও হয় যে, কোন বিশেষ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে এ বিষয়টি পুরোপুরি অনুভব করা যায় যে, এটি সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য উপযোগী নয়। এতদসত্ত্বেও একে কেবল এ উদ্দেশ্যে চালু থাকতে দেয়া হয় যে, (একে অচল করে দেয়া) এমন একটি প্রভাবশালী মহলের স্বার্থের পরিপন্থি, যাদের সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব বিদ্যমান। যেহেতু (গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায়) জনগণের শাসনের ঊর্ধ্বে যে কোন কর্তৃপক্ষকে পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়েছে এবং Trust in God-এর মূলনীতিকে (যা প্রত্যেক মার্কিন ডলারে লিখিত রয়েছে) সামাজিক, অর্থনৈতিক অঙ্গন থেকে পুরোপুরি হটিয়ে দেয়া হয়েছে। এজন্য সে ব্যবস্থায় কোন স্বীকৃত আসমানী হিদায়াত বা দিকনির্দেশনা নেই, যা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট অপকর্ম ও অশ্লীলতাকে প্রতিরোধ করার জন্য এ ছাড়া আর কোন পথে নেই যে, আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা মেনে নিয়ে তাঁর বিধি-বিধানের আনুগত্য স্বীকার করতে হবে এবং সে বিধানাবলীকে এমন যথার্থ মনুষ্য-শক্তির ঊর্ধ্বের হিদায়াত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে যার উপর সর্বাবস্থায় যে কোন মূল্যে আমল করা অত্যাবশ্যক বলে গণ্য হবে। মূলত এটাই ইসলামী জীবনব্যবস্থার সারকথা। ব্যক্তি মালিকানা ও ব্যক্তি স্বার্থের চেতনা এবং বাজারের ক্ষমতা মেনে নিয়ে ইসলাম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করে দিয়েছ। এ সকল বিধি নিষেধ যেহেতু আল্লাহর পক্ষ হতে আরোপিত, যাঁর জ্ঞান অসীম ও অনন্ত, যেহেতু এ বিধি-নিষেধসমূহ মানুষের জ্ঞানলব্ধ গবেষণা দ্বারা হটানো যাবে না। সুদী লেনদেন, জুয়া, গুদামজাতকরণ, কালোবাজারী,



অবৈধ পণ্য এবং অবৈধ সেবার লেনদেন, যে পণ্য নিজের মালিকানায় নেই, তার বেচাকেনা (Short Selling) ইত্যাদির নিষিদ্ধতা আল্লাহ প্রদত্ত সেই বিধি নিষেধের কয়েকটি উদাহরণ। এমন বিধি নিষেধ ও নিয়মনীতি সম্মিলিতভাবে অর্থ-ব্যবস্থার উপর একটি সামগ্রিক প্রভাব বিস্তার করে। যার ফলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য, সম্পদের সুষম বণ্টন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সামঞ্জস্যতা আসে।

## (৩) প্রকৃত সম্পদের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থায়ন ঃ
### (Asset-0 Backed Financing)

ইসলামী অর্থায়নের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য হল ইহা প্রকৃত সম্পদের[১] উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থায়ন। অর্থায়ন বা অর্থ সংস্থান (Financing)-এর প্রচলিত পুঁজিবাদি ধারণা হলো ব্যাংক ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র অর্থ [ধাতব বা কাগজী মুদ্রা (Money)] বা অর্থের বিকল্প দলীল হিসাবে প্রতিনিধিত্বকারী কোন কাগজ বা Monetary papers (যেমন বন্ড) লেনদেন করে থাকে। (এটি একটি মধ্যস্বত্ত্বভোগী প্রতিষ্ঠান মাত্র) এ কারণেই পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পণ্য দ্রব্যের ব্যবসা এবং ব্যবসার জন্য পণ্য গুদামজাত করার অনুমতি নেই। যেহেতু ইসলাম মুদ্রা (Money)-কে ক্ষেত্র বিশেষ ব্যতীত ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে স্বীকার করে না। কেননা, মুদ্রার উপকার পৌছানোর মত নিজস্ব স্বত্বাগত অভ্যন্তরীন কোন ক্ষমতা নেই। বরং তা পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম (Medium of Exchange) মাত্র। এর প্রতিটি একক সেই একই মুদ্রার অন্য এককের শতকরা একশতভাগ সমমানের। (যেমন- এক টাকার একটি নোট আরেকটি এক টাকার একটি নোটের ১০০% সমান গণ্য করা হবে, যদিও একটি নতুন আরেকটি পুরাতন এবং একটি নগদ আরেকটি বাকি হোক না কেন)।

সুতরাং মুদ্রার এককসমূহের পারস্পরিক লেনদেনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের কোন অবকাশ নেই। মুনাফা ঐ ক্ষেত্রে অর্জন করা যেতে পারে,

---

১.প্রকৃত সম্পদ হচ্ছে সে সকল সম্পদ যার অপরের অভাব পুরণের নিজস্ব সত্ত্বাগত ক্ষমতা (উপযোগ) এবং বিনিময় মূল্য আছে। -সম্পাদক

যে ক্ষেত্রে মুদ্রার বিনিময়ে এমন কিছু পণ্য সামগ্রী বেচাকেনা করা হবে, যার নিজস্ব এবং স্বত্বাগত মূল্য রয়েছে। অথবা বিভিন্ন মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা যেতে পারে। (যেমন- পাকিস্তানী (বাংলাদেশী) মুদ্রা আমেরিকান ডলারের বিনিময়ে লেনদেন করা)। একই ধরনের মুদ্রা বা তার দলীল হিসাবে প্রতিনিধিত্বকারী কোন কাগজ (যেমন বন্ড ইত্যাদি)-এর লেনদেন করে অর্জিত মুনাফা সুদ এবং হারাম। এ কারণে প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিপরীতে ইসলামী পদ্ধতিতে ফিন্যান্সিং-এর ভিত্তি হল সর্বদা অতরল বস্তুগত (Illiquid)[১] সম্পদের উপর। ফলে ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রকৃত সম্পদ এবং ব্যবসার পণ্য-সামগ্রী (Inventories) অস্তিত্বে আসে।

শরীয়তে ফিন্যান্সিং-এর মূল এবং আদর্শ পদ্ধতি হচ্ছে 'মুশারাকা' এবং 'মুযারাবা'। যখন কোন পুঁজি সরবরাহকারী (Financier) উক্ত পদ্ধতি দু'টোর ভিত্তিতে বৃহদায়তন পুঁজি বিনিয়োগ করতে চায়, তখন এটা অত্যাবশ্যক হয়ে যায় যে, পুঁজিকে স্বত্বাগত মূল্য বহন করে এমন কোন সম্পদে রূপান্তরিত করা। মুনাফা উক্ত প্রকৃত সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে অর্জন করা যাবে।

'সালাম' এবং 'ইসতিসনা' পদ্ধতির ভিত্তিতে যে ফিন্যান্সিং করা হয় তার মাধ্যমেও প্রকৃত সম্পদ অস্তিত্বে আসে। 'সালাম' (অগ্রিম ক্রয়) পদ্ধতিতে অর্থায়নকারী (পুঁজি সরবরাহকারী) প্রকৃত সম্পদ অর্জন করে তা বাজারে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করতে পারে। 'ইসতিসনা' পদ্ধতিতে ফিন্যান্সিং-এ কিছু প্রকৃত সম্পদ উৎপাদনের (Manufacturing) মাধ্যমেই কার্যকর হয়। যার দ্বারা ফাইন্যান্সার মুনাফা অর্জন করে।

ইজারা পদ্ধতিতে অর্থায়ন (Financial lease) এবং মুরাবাহা সম্পর্কে পরবর্তিতে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে জানা যাবে যে, তা মূলত ফিন্যান্সিং-এর আদর্শিক পদ্ধতি নয়। অবশ্য কিছু কিছু প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে সেগুলোকে নতুন রূপ দেয়া হয়েছে। তবে যেক্ষেত্রে 'মুশারাকা', 'মুদারাবা', 'সালাম' এবং 'ইসতিসনা'-এর পদ্ধতি কোন কারণে অবলম্বন করা না যায়, সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন পূরণের জন্য উক্ত পদ্ধতি দু'টো (শরীয়ত

১. যে সকল সম্পদ নগদ টাকায় (অর্থাৎ স্বল্প সময়ে ও খরচে) রূপান্তর করা যায় না।



নির্দেশিত) শর্তসাপেক্ষে বিনিয়োগ পদ্ধতি (Mode of financing) হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

মুরাবাহা এবং ইজারা পদ্ধতির অর্থায়নের ব্যাপারে সাধারণত এ প্রশ্ন করা হয় যে, এগুলোর সমাপ্তি সুদী ঋণ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। প্রশ্নটি একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সঠিক। কারণ ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শরীয়াহ এডভাইজারী বোর্ড এ বিষয়ে একমত যে, এ পদ্ধতি দু'টো ফিন্যান্সিং-এর আদর্শিক পদ্ধতি নয়। সুতরাং এগুলোকে শরীয়তের পক্ষ হতে নির্ধারিত শর্তসমূহের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রেখে শুধুমাত্র প্রয়োজনের সময়ই ব্যবহার করা উচিত। এতদ্‌সত্ত্বেও 'মুরাবাহা' এবং 'ইজারা' পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে সম্পদের উপর ভিত্তিশীল ফিন্যান্সিং পদ্ধতি। উপরোক্ত পদ্ধতির অর্থায়ন সুদী অর্থায়ন থেকে নিম্নবর্ণিত কারণের ভিত্তিতে সুস্পষ্টভাবে ভিন্নতর হয়ে যায়।

(১) আধুনিক ফিন্যান্সিং-এর প্রচলিত পদ্ধতিতে ফাইন্যান্সার গ্রাহক (Client)- কে সুদি ঋণের ভিত্তিতে অর্থ প্রদান করে। ফাইন্যান্সার কর্তৃক প্রদেয় অর্থ গ্রাহক (Client) কোথায় কিভাবে ব্যবহার করল, এ ব্যাপারে ফাইন্যান্সারের কোন চিন্তা-ভাবনা থাকে না। অপরদিকে মুরাবাহার ক্ষেত্রে ফাইন্যান্সার স্বীয় গ্রাহককে সরাসরি নগদ অর্থ প্রদানই করে না বরং ফাইন্যান্সার নিজে গ্রাহকের প্রয়োজন মাফিক পণ্য সামগ্রী (Commodity) ক্রয় করে তা গ্রাহকের নিকট বাকিতে অধিক মুনাফায় বিক্রি করে। যেহেতু মুরাবাহার এই লেনদেন ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণই হয় না, যতক্ষণ না গ্রাহক (Client) ফাইন্যান্সারকে এ নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, সে তার প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী ক্রয় করবে। সুতরাং ফাইন্যান্সার গ্রাহকের প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী ক্রয় না করা পর্যন্ত মুরাবাহা সম্ভব নয়। এভাবে মুরাবাহা পদ্ধতির পিছনে সর্বদা প্রকৃত সম্পদ বিদ্যমান থাকে।

(২) প্রচলিত অর্থায়ন পদ্ধতিতে যে কোন ধরনের লাভ বা উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ঋণ দেয়া যায়। জুয়াখানার মালিক জুয়ার কারবারে উন্নতি সাধনকল্পে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। অশ্লীল ম্যাগাজিন, উলঙ্গ ও চরিত্র বিধ্বংসী ফিল্ম প্রস্তুতকারক কোম্পানীও এমনিভাবে কোন ব্যাংকের একজন শেয়ার হোল্ডার হতে পারে যেমনিভাবে একজন দীনদার-পরহেজগার গৃহনির্মাতা ব্যক্তি হতে পারে। এরূপ প্রচলিত ফিন্যান্সিং-এ

খোদায়ী ও ধর্মীয় পাবন্দির ক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। পক্ষান্তরে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান মুরাবাহা বা ইজারা পদ্ধতিতে শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ বা সমাজের চরিত্র হননকারী এমন কোন উদ্দেশ্যে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে না।

(৩) মুরাবাহা বৈধ হওয়ার জন্য এটাও একটি শর্ত যে, মুরাবাহা ফাইন্যান্সারের ক্রয়কৃত পণ্যে (Commodity) হতে হবে। (যদিও কিছুক্ষণের জন্য হলেও উক্ত পণ্য ফাইন্যান্সারের মালিকানা ও কব্জায় থাকতে হবে)। অর্থাৎ ফাইন্যান্সার উক্ত পণ্যটি গ্রাহকের নিকট বিক্রির পূর্বে তার ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে। **ফাইন্যান্সার যে মুনাফা পেয়ে থাকেন, তা উক্ত ঝুঁকি বহনের ফলেই পেয়ে থাকেন।** কিন্তু সুদি লেনদেনে দ্রব্যটির কোন দায়ভার বা ঝুঁকি ফাইন্যান্সার বহন করে না।

(৪) সুদি ঋণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহিতাকে যে অর্থ পরিশোধ করতে হয় তা (ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত) সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অপরদিকে মুরাবাহার ক্ষেত্রে উভয়পক্ষের মাঝে দ্রব্যের মূল্য একবার ধার্য হওয়ার পর নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলেও পূর্ব মূল্যই বলবৎ থাকে। **সুতরাং ক্রেতা (ব্যাংকের গ্রাহক) যদি সময়মত মূল্য পরিশোধ না করে তথাপিও বিক্রেতা (ব্যাংক) এই বিলম্বের কারণে অতিরিক্ত মূল্য দাবী করতে পারে না।** কেননা, শরীয়তে মুদ্রার উপর অতিবাহিত সময়ের মূল্য গ্রহণ করার কোন বৈধতা নেই।

(৫) ইজারা বা ভাড়ার পদ্ধতিতেও ফিন্যান্সিং-এর প্রস্তাব একটি ব্যবহার উপযোগী দ্রব্যের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যে প্রপার্টি ইজারা বা ভাড়ার ভিত্তিতে দেয়া হয়, তা ভাড়া চলাকালীন সময়ে ভাড়া প্রদানকারী (ফাইন্যান্সার)-এর দায়ভার ও ঝুঁকিতে থাকবে। **এজন্য ভাড়ায় প্রদত্ত দ্রব্যটি ভাড়াটিয়ার সীমালঙ্ঘন বা অবহেলা ব্যতীত যদি স্বাভাবিক কারণে বা অন্য কোনভাবে নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে ভাড়া প্রদানকারী (ফাইন্যান্সার) এর ক্ষতি বহন করবে।**

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, ইসলামী পদ্ধতিতে প্রত্যেক ফিন্যান্সিং প্রকৃত সম্পদ অস্তিত্বে আনে। এমনকি মুরাবাহা বা লীজ-ভাড়ার পদ্ধতির ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। **অথচ সত্যিকারার্থে**



**মুরাবাহা এবং ইজারাকে ইসলামী ফিন্যান্সিং-এর আদর্শিক পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা হয়নি। বরং সাধারণত চূড়ান্ত পর্যায়ে এগুলোর উপর সুদি ঋণের কাছাকাছি হওয়ার অভিযোগ করা হয়।** অপরদিকে এ কথা পরিজ্ঞাত যে, সুদভিত্তিক ফিন্যান্সিং অপরিহার্যভাবে প্রকৃত সম্পদ সৃষ্টি করে না। এ কারণে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে জারিকৃত ঋণের ফলে মুদ্রার যে যোগান (Supply) অস্তিত্বে আসে তা সমাজে সৃষ্ট প্রকৃত সম্পদ এবং সেবার সাথে সামঞ্জস্য রাখে না। (বরং তার থেকে বেড়ে যায়) কেননা, এসব ঋণ কাল্পনিক মুদ্রা সৃষ্টি করে,[১] যার ফলে সে পরিমাণ প্রকৃত সম্পদ সৃষ্টি না হয়ে মুদ্রার যোগান বেড়ে যায়। বরং কোন কোন সময় কয়েকগুণ বেড়ে যায়। মুদ্রার যোগান এবং প্রকৃত সম্পদ উৎপাদনের এ পার্থক্য মুদ্রার আধিক্যতা সৃষ্টি করে কিংবা তাতে সংযোজন করে। ইসলামী পদ্ধতিতে যেহেতু ফিন্যান্সিং-এর বিপরীতে সম্পদ অবশ্যই থাকে একারণে এর বিপরীতে আগত পণ্য এবং সেবার সাথে সর্বদা তার সামঞ্জস্যতাও বিদ্যমান থাকে।

## (৪) মূলধন এবং উদ্যোক্তা ঃ
### (Capital and Entrepreneur)

পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে মূলধন (Capital) এবং উদ্যোক্তা দু'জন দু'দৃষ্টিকোন থেকে উপার্জনকারী। প্রথমটি (মূলধন) সুদ উপার্জন করে, আর দ্বিতীয়টি (উদ্যোক্তা) মুনাফার অধিকারী হয়। সুদ হল বিনিয়োগকৃত মূলধনের উপর নির্ধারিত লাভ। আর মুনাফা কেবল ঐ অবস্থা-ই অর্জিত হয়, যখন ভূমি, শ্রম ও পুঁজির নির্ধারিত লাভ (পারিশ্রমিক এবং সুদ) প্রদানের পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে। (উদ্যোক্তা তা ভোগ করে)।

**অপরদিকে ইসলাম মূলধন এবং উদ্যোক্তা এ দু'টোকে উৎপাদনের পৃথক পৃথক উপার্জনকারী হিসেবে স্বীকার করে না।** যে ব্যক্তি কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে (নগদ ক্যাশে) মূলধন বিনিয়োগ করে, সে লভ্যাংশের সাথে সাথে লোকসানের ঝুঁকি-দায়ভারও অবশ্যই বহন করে থাকে। এজন্য সে

১. এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা ইসলাম আওর জাদীদ মাঈসাত ওয়া তিজারাত দ্রষ্টব্য; পৃষ্ঠা নং- ১২৩-১২৫।

পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আনুপাতিক হারে প্রকৃত লভ্যাংশ প্রাপ্তির অধিকারী হয়। **এভাবে ব্যবসায় লোকসানের দায়ভার বহনকারী হিসেবে মূলধনও উদ্যোক্তা হতে পারে।** এ জন্য সে সুদরূপে একটি নির্ধারিত লাভের স্থলে মুনাফা অর্জন করে, ব্যবসার লাভ যত বৃদ্ধি পাবে, মূলধন-এর লাভও (Return) ততই বেড়ে যাবে। এভাবে সমাজে প্রচলিত ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা সেসব লোকদের মধ্যে ইনসাফভিত্তিক বণ্টিত হবে, যারা ব্যবসায় মূলধন যোগান দিয়ে থাকে, তাদের এ মূলধন যত কমই হোক না কেন।

আধুনিক কর্মনীতি অনুযায়ী যেহেতু ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহই এমন প্রতিষ্ঠান যে, তারা তাদের নিকট জমাকৃত আমানতসমূহের মধ্য থেকে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের মূলধন সরবরাহ করে, সেহেতু উক্ত মূলধনের প্রকৃত লভ্যাংশ সাধারণ আমানতকারী (Depositors) দের মধ্যেও ইনসাফ ও ন্যায়ের ভিত্তিতে বণ্টন হবে। যার ফলে ধন-সম্পদ গুটিকতেক ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভূত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে এবং তা এক বৃহৎ অঙ্গনে বণ্টিত হবে।

## (৫) ইসলামী ব্যাংকসমূহের বর্তমান কার্যক্রম ঃ

ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কখনো কখনো এ যুক্তি পেশ করা হয় যে, বিগত তিন দশক যাবত যেসব ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করে আসছে, সেসব প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক সেটআপে এমনকি শুধু অর্থায়নের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য তেমন কোন পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়নি। এর দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, ইসলামী ব্যাংকিং-এর ছত্রছায়ায় "সম্পদ বণ্টনে ইনসাফ" (Distributive justice) এর জোর দাবী করা অতিরঞ্জিত বৈ কিছুই নয়।

কিন্তু এ আপত্তিকর সমালোচনা বাস্তব সম্মত নয়। কেননা প্রথমত, ইসলামী ব্যাংকসমূহকে প্রচলিত ব্যাংকেসমূহের সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে, ইসলামী ব্যাংকগুলোর অবস্থান সমুদ্রের বিশাল জলরাশির মধ্যে এক ফোঁটা পানির সমতূল্য। সুতরাং এ স্বল্প সময়ে অর্থ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের মহাবিপ্লব ঘটানোর ধারণা করা ঠিক নয়।



দ্বিতীয়ত, ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এখনো তাদের শৈশবকাল অতিক্রম করছে। তাদেরকে অনেক বাধাবিঘ্ন ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হয়। ফলে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কোন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের সকল চুক্তিতে শরীয়তের সকল শর্ত পালনে সক্ষম হয় না। এজন্য এসব প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত সকল চুক্তি ও লেনদেনকে শরীয়তের সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না।

তৃতীয়ত, ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণত সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার, কর ব্যবস্থা, আইন ব্যবস্থা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সহযোগিতা লাভে সক্ষম হয় না। এমতাবস্থায় ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনের ভিত্তিতে এমন কিছু বিশেষ সুযোগ (রুখসাত ও রেয়ায়াত) প্রদান করা হয়, যা শরীয়তের মৌলিক ও আদর্শিক নিয়ম-নীতি ভিত্তিক নয়।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। তার বিধি-বিধানের দু'টি দিক রয়েছে। প্রথমটি হল- শরীয়তের মূল লক্ষ্য ও আদর্শ ভিত্তিক। যেগুলোর উপর সাধারণ অবস্থায় আমল করা হয়। দ্বিতীয়টি হল- সুযোগ-অবকাশ তথা রুখসাত ভিত্তিক। যেগুলোর উপর জরুরী ও অস্বাভাবিক অবস্থায় আমল করার অনুমতি দেয়া হয়। সত্যিকার ইসলামী ব্যবস্থাপনার ভিত্তি প্রথমটি তথা আদর্শিক মূলনীতির উপর। আর দ্বিতীয়টি হল রুখসাত যা প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু এর দ্বারা ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থার প্রকৃত চিত্র পরিস্ফুটিত হয় না।

**অনেক প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতার কারণে সাধারণত ইসলামী ব্যাংকসমূহ দ্বিতীয় প্রকারের বিধানাবলী তথা রুখসাতের উপরই তাদের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ রাখে। ফলে ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলেও সুস্পষ্ট কোন পরিবর্তন আনতে পারছে না।** তবে যদি পুরো অর্থায়ন পদ্ধতি ইসলামের আদর্শ ও মৌলিক নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তাহলে অবশ্যই অর্থব্যবস্থার উপর এর দৃশ্যমান প্রভাব পরিলক্ষিত হবে।

এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, গ্রন্থটি যেহেতু যুগের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে, সেহেতু এতে ইসলামী বিধি-বিধানের উভয়দিক নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম

পর্যায়ে ইসলামী ফিন্যান্সিং-এর আদর্শিক মূলনীতিসমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তিতে ঐ সকল সম্ভাব্য সুন্দর সুন্দর (অবকাশ) পদ্ধতি নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে, যেগুলো অস্থায়ী (সাময়িক) ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেখানে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমান আইনগত এবং আর্থিক পদ্ধতির প্রতিকূলতার মাঝে কাজ করে যাচ্ছে, সেখানে উক্ত অবকাশসমূহের ব্যাপারেও শরীয়তের সুস্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে। এর মহৎ একটি উদ্দেশ্য হল- তুলনামূলক উত্তম কর্মপন্থা অবলম্বন করে সুস্পষ্ট হারাম থেকে বেঁচে থাকা। এর দ্বারা যদিও সঠিক ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বুনিয়াদী উদ্দেশ্য সাধনে কাংখিত অধিক সহায়তা লাভ হবে না, তবে এ কর্মপন্থা হারাম থেকে বেঁচে থাকার এবং আল্লাহ তা'আলার নাফরমানির অশুভ পরিণাম থেকে মুক্তি লাভের ক্ষেত্রে অবশ্যই সহায়ক হবে যা একজন মুসলমানের জন্য ব্যক্তি সত্তায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য, যদিও তা ব্যক্তিগত পর্যায়েই হোক না কেন। এ ছাড়া এর দ্বারা সমাজে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার আদর্শিক লক্ষ্যবস্তুর দিকে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রেও সহায়তা লাভ হবে। তাই ইসলামী শরীয়তের এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই বক্ষমান গ্রন্থটি পাঠ করা উচিত।

# মুশারাকা
# বা
# অংশীদারী কারবার

"মুশরাকা" মূলত আরবী শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ শরীক বা অংশীদার হওয়া। কারবার ও ব্যবসাবাণিজ্যের পরিভাষায় মুশারাকা বলতে এমন এক যৌথ কারবারকে বুঝায়, যে কারবারে সকল অংশীদার যৌথ কারবারের লাভ লোকসানে শরীক থাকে। মুশারাকা বা অংশীদারি কারবার সুদভিত্তিক অর্থায়নের একটি আদর্শিক বিকল্প ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টন উভয়ের সাথে অংশীদারগণ জড়িত থাকে। আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় সুদই একমাত্র মাধ্যম যাকে সর্বপ্রকারের অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ইসলামে যেহেতু সুদ হারাম, সেহেতু একে কোন ধরনের অর্থায়ন (Financing) এর জন্য ব্যবহার করা যায় না। এজন্য ইসলামী মূলনীতিভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থায় 'মুশারাকা' সময়ের দাবী পূরণে বড় ধরনের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

সুদি ব্যবস্থাপনায় ফাইন্যান্সার কর্তৃক প্রদেয় ঋণের উপর অতিরিক্ত পরিশোধযোগ্য টাকার পরিমাণ পূর্বেই ধার্য করা হয়। ঋণগ্রহীতার লাভ হোক বা লোকসান হোক, এর প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। অপরদিকে মুশারাকায় পরিশোধযোগ্য অর্থের পরিমাণ পূর্বে ধার্য করা হয় না। বরং এতে মুনাফার ভিত্তি হল অংশীদারি কারবারে অর্জিত প্রকৃত মুনাফার উপর। সুদি কারবারে বিনিয়োগকারী (ফাইন্যান্সার) কোন অবস্থাতেই লোকসানের দায়িত্ব বহন করে না। কিন্তু মুশারাকায় ফাইন্যান্সারের লোকসানও হতে পারে, যদি এ যৌথ ব্যবসায় লাভ না হয়।

ইসলাম সুদকে একটি ইনসাফবিবর্জিত পন্থা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। কেননা, এর ফলাফল ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা উভয়ের মাঝে বৈষম্য ও বে-ইনসাফীর আকারে প্রকাশ পায়। যদি ঋণগ্রহীতার ব্যবসায় লোকসান হয় তাহলে ঋণদাতার পক্ষ থেকে অতিরিক্ত অর্থের দাবী করা বে-ইনসাফী। অন্যদিকে যদি ঋণগ্রহীতা ব্যবসায় প্রচুর পরিমাণ লাভবান হয়, তাহলে লাভের সামান্যতম অংশ ঋণদাতাকে দিয়ে অবশিষ্ট সমুদয় লভ্যাংশ ঋণগ্রহীতার কুক্ষিগত করাও ইনসাফসম্মত নয়।

আধুনিক অর্থব্যবস্থায় ব্যাংক-ই একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান, যে তার একাউন্ট হোল্ডারদের অর্থ থেকেই শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদেরকে ঋণ প্রদান করে থাকে। যদি কোন শিল্পপতির কাছে শুধু দশ মিলিয়ন টাকা থাকে, তাহলে সে ব্যাংক থেকে আরো নব্বই মিলিয়ন টাকা ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এ অর্থের মাধ্যমে সে একটি বড় লাভজনক প্রজেক্ট শুরু করে। এতে বুঝা গেল যে, উক্ত প্রজেক্টের নব্বই শতাংশ ব্যাংকের সাধারণ একাউন্ট হোল্ডারদের (গ্রাহকদের) অর্থ থেকে এবং বাকী মাত্র দশ শতাংশ ঋণগ্রহীতার ব্যক্তিগত মূলধন থেকে সংস্থাপন করা হয়েছে। যদি এই প্রজেক্টে প্রচুর পরিমাণে মুনাফা অর্জিত হয়, তাহলে তার ক্ষুদ্রতম একটি অংশ (যেমন- শতকরা ১৪ বা ১৫ ভাগ) ব্যাংকের মাধ্যমে সাধারণ একাউন্ট হোল্ডারদের কাছে যায়। অবশিষ্ট সমূদয় মুনাফা ঋণগ্রহীতা শিল্পপতি পেয়ে থাকে। অথচ উক্ত প্রজেক্টে শিল্পপতির অংশ ছিল মাত্র শতকরা দশ ভাগ। অতপর যে ১৪-১৫% মুনাফা সাধারণ একাউন্ট হোল্ডারগণ পেয়ে থাকেন, তাও শিল্পপতি সুকৌশলে হস্তগত করে নেন। তা এভাবে যে, শিল্পপতি ব্যাংকের সুদকেও পণ্য উৎপাদনের ব্যয় হিসেবে গণ্য করেন। (ফলে উৎপাদিত পণ্যের দাম বেড়ে যায়) অবশেষে ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, এ কারবারের সমুদয় মুনাফা ঐ সকল লোকদের নিকট পুঞ্জিভূত হয়ে যায়, যাদের মূলধন সমুদয় মূলধনের শতকরা দশভাগের বেশি ছিল না। পক্ষান্তরে যে জনগণ শতকরা নব্বই ভাগ মূলধনের মালিক, তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ ছাড়া আর কিছুই পায় না। এবং পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে তাও তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হয়। অপরদিকে যদি কোন অস্বাভাবিক কারণে শিল্পপতি দেউলিয়া হয়ে যায়, তাহলে তার লোকসান মাত্র শতকরা দশভাগের বেশি হয় না। আর অবশিষ্ট নব্বই শতাংশ লোকসান পুরোপুরিভাবে ব্যাংক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণ একাউন্ট হোল্ডারদেরকেও বহন করতে হয়। এভাবে সুদি লেনদেনে সাধারণ জনগণ তিলে তিলে শোষিত হয়ে সর্বহারাদের কাতারে এসে দাঁড়ায়, আর শিল্পপতিরা জনগণের টাকা শোষণ করে পুঁজিপতি বনে যায়।



অপরদিকে ইসলামে পুঁজি বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা বিদ্যমান রয়েছে। তা হল- পুঁজি বিনিয়োগকারীদেরকে অবশ্যই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে, তিনি ঋণগ্রহীতার সহায়তার লক্ষ্যে ঋণ প্রদান করছেন নাকি ঋণগ্রহীতার মুনাফায় অংশীদার হতে চাচ্ছেন? যদি সহযোগিতা করাই তার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু দাবী করা যাবে না। কেননা, তার উদ্দেশ্যই হল, ঋণগ্রহীতার সহযোগিতা করা। আর যদি ঋণগ্রহীতার ব্যবসায়িক মুনাফায় অংশীদারিত্ব উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তাকে ঋণগ্রহীতার ব্যবসায়িক লোকসানেও অবশ্যই অংশীদার হতে হবে। সুতরাং মুশারাকা বা অংশীদারী কারবারে ফাইন্যান্সারের মুনাফা ব্যবসায় অর্জিত প্রকৃত লাভের সাথে সম্পৃক্ত। ব্যবসায় মুনাফা যত বেশি হবে, ফাইন্যান্সারের মুনাফার অংশও ততই বৃদ্ধি পাবে। যদি অংশীদারী কারবারে প্রচুর পরিমাণে মুনাফা অর্জিত হয়, তাহলে শিল্পোদ্যক্তাদের এককভাবে তা পুঞ্জিভূত করার সুযোগ থাকে না। বরং ব্যাংকের একাউন্ট হোল্ডার হিসেবে সাধারণ লোকজনও তাতে অংশীদার হয়। এভাবে মুশারাকা পদ্ধতিতে পুঁজিপতিদের তুলনায় সাধারণ জনগণের সহযোগিতার বিষয়ই অগ্রাধিকার পায়।

এ মৌলিক দর্শনের ভিত্তিতেই ইসলাম মুশরাকা বা অংশীদারী কারবারকে সুদি অর্থায়ন (Finance)-এর বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। এ কথা সত্য যে, মুশারাকা বা অংশীদারী কারবারকে ব্যাপক অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে পূর্ণাঙ্গরূপ দেয়ার ক্ষেত্রে বর্তমান যুগে অনেক প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে। কখনো কখনো এ ধারণাও করা হয় যে, মুশারাকা একটি প্রাচীন অর্থায়ন পদ্ধতি। যা গতিশীল লেনদেনের নিত্য-নতুন প্রয়োজন পূরণে সক্ষম নয়। কিন্তু এ জড়বাদী বিষাক্ত ধারণা মুশারাকার শরয়ী মূলনীতি সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অভাবই জন্ম দিয়েছে। মূলত

ইসলাম মুশারাকা বা অংশীদারী কারবারের কোন ধরাবাঁধা রূপ বা সুনির্দিষ্ট কোন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে দেয়নি। বরং এমন কিছু মৌলিক নিয়ম-নীতি বর্ণনা করে দিয়েছে, যাতে বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অবলম্বনের সুযোগ রয়েছে। মুশারাকা বা অংশীদারী কারবারের নতুন কোন পদ্ধতি বা কর্মপন্থাকে অতীতকালে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না বলেই অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। কেননা, মুশারাকা বা অংশীদারি কারবারের নিত্য-নতুন পদ্ধতি যদি কুরআন, হাদীস ও ইজমায়ে উম্মতের পরিপন্থি না হয়, তাহলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে। সুতরাং মুশারাকা বা অংশীদারি কারবার শরীয়তসম্মত হওয়ার ক্ষেত্রে আদি ও প্রাকযুগের প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত হওয়া জরুরী নয়।

এ অধ্যায়ে মুশারাকা বা অংশীদারী কারবারের বুনিয়াদী মূলনীতি এবং এর ঐ সকল পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যেসব পদ্ধতি আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও কায়কারবারে অবলম্বন করা যেতে পারে। এ আলোচনার উদ্দেশ্য হল উক্ত মৌলিক নীতিমালার বিরুদ্ধাচরণ না করে মুশারাকা বা অংশীদারী কারবারকে আধুনিক অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়া। ইসলামী ফিক্‌হের গ্রন্থাবলী এবং ঐসব বুনিয়াদী জটিলতাসমূহকে সামনে রেখে মুশারাকার পরিচয় উপস্থাপন করা হয়েছে, যেসব জটিলতা আধুনিক প্রেক্ষাপটে মুশারাকার বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে উদ্ভব হতে পারে। আশা করি এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা মুসলিম ফকীহ এবং অর্থনীতিবিদদের চিন্তা ও গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং সত্যিকার ইসলামী অর্থব্যবস্থা চালু করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

## মুশারাকার স্বরূপ

'মুশারাকা' এমন একটি পরিভাষা যা ইসলামী অর্থায়ন (Modes of Financing)-এর ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইসলামী ফিক্‌হের গ্রন্থাবলীতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত শিরকত পরিভাষার তুলনায় মুশারাকা পরিভাষার ব্যবহার অনেকটা সীমিত। এ উভয়টির মৌলিক ধারণা সুস্পষ্ট করার জন্য প্রথমেই মুশারাকা এবং শিরকত



পরিভাষার বিশদ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন মনে করি, যাতে একটির সাথে অপরটির পার্থক্য বুঝে আসে।

ইসলামী ফিক্‌হ শাস্ত্রে "শিরকত" অর্থ "অংশীদার হওয়া"। ফিক্‌হী দৃষ্টিকোণ থেকে শিরকতকে প্রথমে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

**(১) শিরকাতুল মিল্‌ক (মালিকানায় অংশীদারিত্ব) ঃ** কোন বস্তুতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির যৌথ মালিকানা সাব্যস্ত হওয়াকে শিরকাতুল মিল্‌ক বলে। এ প্রকারের শিরকত দু'ভাবে হতে পারে।

(ক) কখনো তা অংশীদারদের স্বেচ্ছায় কার্যকর হয়। যেমন- দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রে কোন পণ্যসামগ্রী ক্রয় করল। ক্রয় সূত্রে উক্ত পণ্যে উভয়ের যৌথ মালিকানা সাব্যস্ত হয়। এই যৌথ সম্পদের সূত্রে উভয়ের মাঝে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাকে শিরকাতুল মিল্‌ক বলে। এখানে উভয়ের মাঝের এ সম্পর্ক তাদের সন্তুষ্টিতে অস্তিত্বে এসেছে। কেননা তারা উভয়ে উক্ত সম্পদকে যৌথভাবে ক্রয় করার পথ গ্রহণ করেছে।

(খ) কখনো অংশীদারদের অনিচ্ছায় অংশীদারিত্ব হয়ে যায়। যেমন- কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীগণ মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদে উত্তরাধিকার সূত্রে মালিকানা লাভ করে। বিনা চুক্তিতে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারীগণ মালিকানা লাভ করে বিধায় একে শিরকাতুল মিল্‌ক বলে।

**(২) শিরকাতুল আক্বদ (চুক্তিভিত্তিক অংশীদারিত্ব) ঃ** শিরকাতুল আক্বদ বলতে এমন অংশীদারিত্ব (Partnership) কে বুঝায়, যা পারস্পরিক চুক্তি ও অঙ্গীকারের ভিত্তিতে সংঘটিত হয়। সংক্ষেপে আমরা একে (Joint Commercial Enterprise) বলতে পারি।

শিরকাতুল আক্বদ আবার তিন প্রকার ঃ যথা-

**(১) শিরকাতুল আমওয়াল (মূলধনভিত্তিক অংশীদারিত্ব) ঃ** যে কারবারে অংশীদারগণ যৌথভাবে পুঁজি বিনিয়োগ করে, তাকে শিরকাতুল আমওয়াল বলে।

**(২) শিরকাতুল আ'মাল (শ্রমভিত্তিক অংশীদারিত্ব) ঃ** যে কারবারে অংশীদারগণ যৌথভাবে গ্রাহকদেরকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং গ্রাহক থেকে অর্জিত পারিশ্রমিক পূর্ব নির্ধারিত হারে পরস্পরের মাঝে বণ্টিত হয়, তাকে শিরকাতুল আ'মাল বলে। যেমন- দু'জন দর্জি এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হল যে, তারা উভয়ে গ্রাহকদেরকে সেলাই সংক্রান্ত সেবা প্রদান করবে এবং তারা এ শর্তেও একমত হলো যে, এভাবে অর্জিত মজুরী এক যৌথ খাতে জমা হতে থাকবে। অতঃপর পরিশ্রম সমান বা কমবেশির প্রতি লক্ষ্য না রেখে তা উভয়ের মাঝে সমহারে বণ্টন হবে। এরূপ চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করাকে শিরকাতুল আ'মাল বলে। এ পদ্ধতিকে শিরকাতুত্ তাকাব্বুল (কাজ সংগ্রহভিত্তিক অংশীদারিত্ব), শিরকাতুস্ সানাই (পেশাভিত্তিক অংশীদারিত্ব) এবং শিরকাতুল্ আব্দান (শারীরিক শ্রমভিত্তিক অংশীদারিত্ব)ও বলে।

**(৩) শিরকাতুল ওজূহ (সুনামভিত্তিক অংশীদারিত্ব) ঃ** যে কারবারে অংশীদারগণ পুঁজি বিনিয়োগ করে না, বরং স্বীয় পরিচিতি ও বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে ব্যবসা পণ্য বাকিতে ক্রয় করে নগদ বিক্রি করে, এতে যে লাভ হয় তা পূর্ব নির্ধারিত হারে অংশীদারগণ বণ্টন করে নেয়। অংশীদারিত্বের এ তিনটি পদ্ধতিকে ইসলামী ফিক্‌হের পরিভাষায় "শিরকত" বলা হয়। কিন্তু "মুশারাকা" পরিভাষাটি ফিক্‌হের গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায় না। এ পরিভাষাটি বর্তমান যুগের ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতির উপর গ্রন্থরচনাকারীদের মাধ্যমে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এ পরিভাষাটি সাধারণত শিরকতের ঐ বিশেষ প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, যাকে শিরকাতুল আমওয়াল বা মূলধনভিত্তিক অংশীদারিত্ব বলা হয়। যে কারবারে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যৌথভাবে নিজ নিজ পুঁজি সরবরাহ করে। এছাড়া কখনো কখনো মুশারাকা পরিভাষাটি শিরকাতুল আ'মালকেও বুঝায়, যখন অংশীদারিত্ব সেবামূলক (Services) কারবারে সংঘটিত হয়।

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা পরিষ্কার প্রতিভাত হয়েছে, যে অর্থে বর্তমান যুগে মুশারাকা পরিভাষাটি ব্যবহার হয়ে থাকে, শিরকত পরিভাষাটি তার চেয়ে ব্যাপক অর্থবোধক। মুশারাকা দ্বারা শুধুমাত্র শিরকাতুল আমওয়াল



(মূলধনভিত্তিক অংশীদারিত্ব)কেই বুঝানো হয়। অপরদিকে শিরকত শব্দে মালিকানায় অংশীদারিত্ব এবং অন্যান্য সকল প্রকারের অংশীদারিত্বই অন্তর্ভুক্ত।

এক নং চিত্রে 'শিরকত'-এর বিভিন্ন প্রকার এবং আধুনিক পরিভাষায় পরিচিত 'মুশারাকার' প্রকারসমূহ বুঝা যাবে।

যেহেতু 'মুশারাকা' আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে বেশি সম্পৃক্ত এবং শিরকাতুল আমওয়ালের প্রায় সদৃশ্য। তাই এ পর্যায়ে আমাদের আলোচনা সেদিকে নিবদ্ধ করব। প্রথমে শিরকাতুল আমওয়ালের ব্যাখ্যা অতঃপর আধুনিক ফিন্যান্সিং-এর ক্ষেত্রে এর প্রয়োগের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।
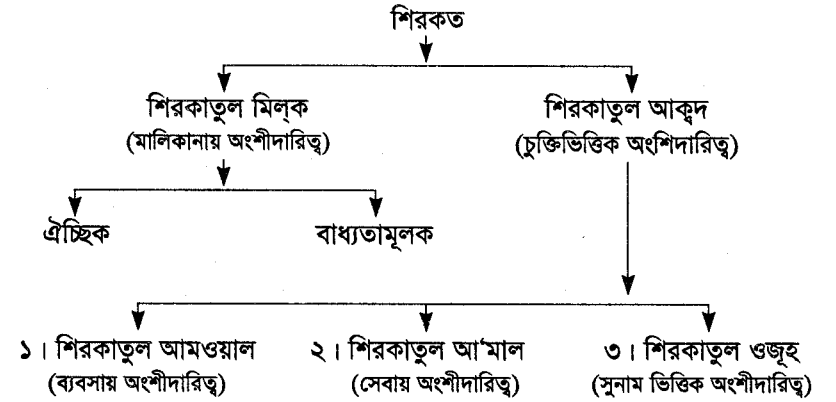
## মুশারাকার মৌলিক বিধি-বিধান

(১) 'মুশারাকা' বা 'শিরকাতুল আমওয়াল' এমন এক সম্পর্ক যা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং

যেকোন চুক্তি সঠিক ও শুদ্ধ হওয়ার অপরিহার্য শর্তাবলী এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, বিধায় তা এখানে বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। যেমন- উভয়পক্ষের মধ্যে চুক্তির যোগ্যতা থাকা। (অর্থাৎ, কেউ অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও উম্মাদ ইত্যাদি না হওয়া) এ চুক্তি যেকোন ধরনের চাপ, ধোঁকা-প্রতারণা ও ভুল বর্ণনা ব্যতীত উভয় পক্ষের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া, ইত্যাদি, ইত্যাদি। তবে এমন কিছু আনুষঙ্গিক বিষয় রয়েছে, যা শুধুমাত্র 'মুশারাকা' চুক্তির সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। সে বিষয়গুলো সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো।

## মুনাফা বণ্টন

(২) অংশীদারদের মাঝে লভ্যাংশ বণ্টনের হার চুক্তি বাস্তবায়নের সময়ই নির্ধারণ করে নিতে হবে। এভাবে লভ্যাংশ বণ্টনের হার নির্ধারণ করা না হলে অংশীদারী কারবারের চুক্তি শরীয়ত সম্মত হবে না।

(৩) প্রত্যেক অংশীদারের মুনাফা বণ্টনের হার প্রকৃত মুনাফার ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে হবে। তার পক্ষ থেকে প্রদত্ত পুঁজির ভিত্তিতে নির্ধারণ করা যাবে না। কোন অংশীদারের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ বা বিনিয়োগকৃত পুঁজির বিনিময়ে নির্ধারিত কোন অংক ধার্য করা বৈধ নয়। (অর্থাৎ- কোন অংশীদারের লভ্যাংশ বণ্টনের হার প্রকৃত লাভের শতকরার ভিত্তিতে নির্ধারণ না করে তার বিনিয়োগকৃত পুঁজির এত শতাংশ লাভ পাবে এরূপ নির্ধারণ করা বৈধ নয়)।

যেমন- 'ক' এবং 'খ' তাদের একটি অংশীদারী কারবারে লভ্যাংশ বণ্টনের হার এভাবে নির্ধারণ করল যে, 'ক' নিজের অংশ হিসেবে প্রতিমাসে লভ্যাংশের দশ হাজার টাকা নিবে। অবশিষ্ট মুনাফা 'খ' গ্রহণ করবে। এ ধরনের অংশীদারিত্ব শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক হবে না। তেমনিভাবে যদি এরূপ চুক্তি করা হয় যে, 'ক' লাভ হিসেবে তার মূলধনের শতকরা পনের ভাগ নিবে, এ ধরণের চুক্তিও বৈধ হবে না। লভ্যাংশ বণ্টনের সঠিক বিধান হল, ব্যবসায় অর্জিত প্রকৃত মুনাফা শতকরার ভিত্তিতে নির্ধারণ করা।



যদি কোন অংশীদারের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ বা তার মূলধনের বিনিময়ে শতকরা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তাহলে চুক্তিনামায় এ বিষয়টিও অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকতে হবে যে, অংশীদারকে প্রদত্ত এ টাকা চুক্তির মেয়াদান্তে সর্বশেষ যে হিসাব-নিকাশ করা হবে তার অধীনে থাকবে। অর্থাৎ, যেকোন অংশীদার যত টাকা নিবে তার সাথে Payment of Account-এর হিসাব-নিকাশ করা হবে। এ টাকা চুক্তির মেয়াদান্তে উক্ত অংশীদারের প্রাপ্য লভ্যাংশের সাথে সংযুক্ত করা হবে। আর যদি ব্যবসায় আদৌ কোন লাভই না হয়ে থাকে বা আশাতীত লাভের তুলনায় কম হয়, তাহলে উক্ত অংশীদার যে পরিমাণ টাকা নিয়েছিল তা ফেরৎ দিতে হবে।

## মুনাফার হার

(৪) মুনাফার হার অংশীদারদের বিনিয়োগকৃত পুঁজির পরিমাণ অনুপাতে হওয়া আবশ্যক কি না? এ প্রশ্নের ব্যাপারে মুসলিম ফিক্‌হবিদদের মধ্যে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়।

ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে প্রত্যেক অংশীদারকে তার বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ অনুপাতে লাভ প্রদান করা 'মুশারাকা' যথার্থ ও বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত। অতএব 'ক' যদি মোট মূলধনের ৪০% বিনিয়োগ করে তাহলে সে লভ্যাংশের ৪০%ই পাবে। সুতরাং লভ্যাংশের ৪০% অপেক্ষা কম বা বেশি নির্ধারণ করে কোন চুক্তি করা হলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে না।

অপরদিকে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতে অংশীদারদের পারস্পরিক আলোচনা সাপেক্ষে লভ্যাংশের হার বিনিয়োগকৃত পুঁজির অনুপাত অপেক্ষা কম বা বেশি হতে পারবে। সুতরাং ৪০% বিনিয়োগকারীর জন্য লাভের ৬০-৭০% এবং ৬০% বিনিয়োগকারীর জন্য শুধুমাত্র ৩০-৪০% গ্রহণ করা বৈধ হবে।[১]

---

১. ইব্‌ন কুদামা, আল-মুগনী, ৫/১৪০, দারুল কিতাবিল আরাবী, বৈরুত, ১৯৭২।

তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কর্তৃক, তিনি উল্লেখিত দৃষ্টিভঙ্গিদ্বয় সমন্বয় করে বলেন, সাধারণ অবস্থায় লভ্যাংশের হার বিনিয়োগকৃত পুঁজির অনুপাত অপেক্ষা কম বা বেশি হতে পারবে। কিন্তু কোন অংশীদার যদি চুক্তিপত্রে এ মর্মে সুস্পষ্ট শর্তারোপ করে যে, সে কখনো সক্রিয়ভাবে ব্যবসায় অংশ গ্রহণ করবে না, বরং মুশারাকার পুরো মেয়াদে সে নিষ্ক্রিয় অংশীদার (Sleeping partner) হিসেবে থাকবে। এমতাবস্থায় তার লভ্যাংশের হার বিনিয়োগকৃত পুঁজির অনুপাত অপেক্ষা বেশি হতে পারবে না।[১]

## লোকসানে অংশীদারিত্ব

লভ্যাংশ বণ্টনের ক্ষেত্রে ফিক্‌হবিদদের মাঝে মতানৈক্য থাকলেও লোকসানের ক্ষেত্রে সকল ইসলামী আইনবেত্তা এ ব্যাপারে একমত যে, প্রত্যেক অংশীদার তার বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ অনুপাতে লোকসান বহন করবে। সুতরাং যে অংশীদার শতকরা ৪০ ভাগ পুঁজি বিনিয়োগ করবে, সে লোকসানের ৪০%ই বহন করবে। কমবেশি বহন করবে না। এর পরিপন্থি যে কোন শর্ত করা হলে তা চুক্তিকে অকার্যকর করে দিবে। এ মূলনীতির ব্যাপারে (লোকসান পুঁজির পরিমাণ অনুপাতে বহন করতে হবে) সকল ফকীহ্‌দের ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[২]

উল্লেখিত আলোচনার সারমর্ম হল- ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে প্রত্যেক অংশীদারের লাভ ও লোকসান উভয়টিই তার পুঁজির পরিমাণ অনুপাতে হতে হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতে অংশীদারদের মধ্যকার সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে লভ্যাংশের হার পুঁজির অনুপাত অপেক্ষা কম বা বেশি হতে পারবে। কিন্তু লোকসানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক অংশীদার তাদের বিনিয়োগকৃত পুঁজির পরিমাণ অনুপাতে লোকসান বহন করতে হবে।

---

১. আল-কাসানী, বাদায়িউস সানা'য়ি, ৬/১৬২-১৬৩।
২. ইব্‌ন কুদামা, আল-মুগনী, ৫/১৪৭।



এ নীতিমালাকে একটি প্রসিদ্ধ ফিক্‌হী সূত্রে (Maxim) এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে- الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على قدر المال "লাভ পাবে উভয়ের মাঝে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী এবং লোকসান হবে বিনিয়োগকৃত মূলধন অনুপাতে।"

## মূলধন বা পুঁজির ধরন

অধিকাংশ ফিক্‌হবিদ এ মত পোষণ করেন যে, প্রত্যেক অংশীদারের বিনিয়োগকৃত পুঁজি-মূলধন তরল [তথা সহজে অর্থে রূপান্তরযোগ্য (Liquid)] প্রকৃতির হতে হবে। অর্থাৎ- 'মুশারাকা' বা অংশীদারী চুক্তি কেবলমাত্র নগদ অর্থে (Money) হতে পারে; পণ্য বা দ্রব্যে নয়। এতদসত্ত্বেও এ বিষয়ে ফিক্‌হবিদদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

(১) ইমাম মালেক (রহ.)-এর নিকট 'মুশারাকা' বা অংশীদারী কারবার বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য মূলধন তরল প্রকৃতির হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং যে কোন অংশীদার অংশীদারী কারবারে দ্রব্যগত প্রকৃতির মূলধনও বিনিয়োগ করতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে উক্ত অংশীদারের অংশের মূল্য চুক্তি সম্পাদনের তারিখের প্রচলিত বাজারদর অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। কোন কোন হাম্বলী ফিক্‌হবিদও এ মত গ্রহণ করেছেন।

(২) ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মত হলো, কোন অংশীদারের অংশ দ্রব্যগত প্রকৃতির মূলধন হতে পারবে না। দু'টো কারণে তারা এ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন।

প্রথমত, তাঁরা বলেন যে, প্রত্যেক অংশীদারের দ্রব্য অপর অংশীদারের দ্রব্য থেকে সর্বদা পৃথক ও ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের হয়ে থাকে। যেমন- 'ক' যদি একটি গাড়ি ব্যবসায় বিনিয়োগ করে এবং 'খ'ও আরেকটি গাড়ি ব্যবসায় বিনিয়োগ করে, এমতাবস্থায় এ দু'টো গাড়ির প্রত্যেকটি তাদের ব্যক্তি মালিকানায়। এখন যদি 'ক' এর গাড়ি বিক্রি করে দেয়া হয়, তাহলে এ বিক্রির সকল দায়-দায়িত্ব অবশ্যই 'ক'-এর উপর বর্তাবে। 'ক'-এর বিক্রিত গাড়ির মূল্যে 'খ' এর কোন দাবী করার অধিকার নেই।

অতএব, যেহেতু প্রত্যেক অংশীদারের সম্পদ অন্য অংশীদারের সম্পদ থেকে স্বতন্ত্র, তাই এ কারবারে কোন অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। পক্ষান্তরে যদি প্রত্যেক অংশীদারের বিনিয়োগকৃত পুঁজি তরল প্রকৃতির (মুদ্রায়) হয়, তাহলে কোন অংশীদারের পুঁজি অপরের পুঁজি থেকে পৃথক করা যায় না। কেননা, মুদ্রা (টাকা-পয়সা) নির্দিষ্ট করা দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না। সুতরাং তারা একটি (Common pool) যৌথ একাউন্ট গঠন করেছেন বলে ধরে নেয়া হবে এবং এভাবে অংশীদারিত্ব অস্তিত্ব লাভ করবে।[১]

দ্বিতীয়ত, 'মুশারাকা' বা অংশীদারী চুক্তিতে কোন কোন সময় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অংশীদারগণকে তাদের প্রত্যেকের অংশ পুনর্বণ্টন করতে হয়। সেক্ষেত্রে বিনিয়োগকৃত পুঁজি তরল না হয়ে দ্রব্যের আকৃতিতে হলে, তা বিক্রি করা ব্যতীত অংশীদারদের মাঝে পুনর্বণ্টন করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় যদি দ্রব্যের বিক্রিত মূল্যের ভিত্তিতে পুঁজি পুনর্বণ্টন করা হয়, তাহলে এমনও হতে পারে, কোন কোন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, এক অংশীদার তার বিনিয়োগকৃত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসার সমুদয় লাভ পেয়ে যাবেন, আর অপর অংশীদারগণ বঞ্চিত হবেন; কিছুই পাবেন না। অপরদিকে যদি উক্ত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পায়, তাহলে এ আশংকা রয়েছে যে, এ অংশীদার তার বিনিয়োগকৃত মূলধন ছাড়াও অন্য অংশীদারের বিনিয়োগকৃত দ্রব্যের প্রকৃত মূল্যের কিছু অংশও হস্তগত করে নিবেন।[২]

(৩) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) উল্লেখিত দু'টি মতের মাঝামাঝি আরেকটি মত গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, দ্রব্য দুই প্রকার। (১) সমতুল্য বস্তু ঃ অর্থাৎ- যে দ্রব্য নষ্ট হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ এমন জিনিস দ্বারা দেয়া যায়, যা গুণাগুণ এবং পরিমাণের দিক থেকে নষ্ট দ্রব্যের সমতুল্য হয়। যেমন গম, চাউল ইত্যাদি। যদি একশ কেজি গম নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে গুণগত দিক থেকে নষ্ট গমের পরিবর্তে আরেকশ' কেজি গম অনায়াসেই দেয়া যায়।

১. আল-কাসানী, বাদায়েউস সানায়ি, ৬/৫৯।
২. প্রাগুক্ত, ১২৫।



(২) মূল্যনির্ভর বস্তু ঃ অর্থাৎ- যে দ্রব্য নষ্ট হয়ে গেলে ঐ জাতীয় দ্রব্য দ্বারা এর ক্ষতিপূরণ দেয়া যায় না। যেমন প্রাণী, জীব-জন্তু। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিটি ছাগলের নিজস্ব বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে, যা অপর ছাগলের মধ্যে পাওয়া যায়না। এ কারণে যদি কোন ব্যক্তি কারো ছাগলকে হত্যা করে, তাহলে সমতুল্য ছাগল দিয়ে উক্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে না। বরং এস্থলে ছাগলের বাজার মূল্য দিয়ে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

এখন ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, প্রথম প্রকারের দ্রব্য (অর্থাৎ সমতুল্য বস্তু)কে 'মুশারাকা'য় পুঁজির অংশ হিসেবে গণ্য করা যাবে। তবে দ্বিতীয় প্রকারের দ্রব্য (অর্থাৎ মূল্যনির্ভর বস্তু)কে পুঁজির অংশ হিসেবে গণ্য করা যাবেনা।[১]

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) দ্রব্যকে দু'ভাগে, তথা সমতুল্য বস্তু ও মূল্যনির্ভর বস্তুতে বিভক্ত করে ইমাম আহমাদ (রহ.) কর্তৃক দ্রব্যগত মূলধন দ্বারা অংশীদারিত্বের উপর উত্থাপিত দ্বিতীয় অভিযোগ নিরসন করে দিয়েছেন। কেননা, পুঁজি সমতুল্য বস্তুর ক্ষেত্রে প্রত্যেক অংশীদারকে তার বিনিয়োগকৃত দ্রব্যের সমতুল্য বস্তু ফেরৎ দেয়ার মাধ্যমে পুনর্বণ্টন সম্ভব। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর পক্ষ থেকে প্রথম অভিযোগের কোন জবাব দেয়া হয়নি। এই অভিযোগ নিরসনে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন, সমতুল্য বস্তু পুঁজি হিসেবে ঐ ক্ষেত্রে পরিগণিত হতে পারে, যে ক্ষেত্রে প্রত্যেক অংশীদারের প্রদত্ত দ্রব্য অপরের অংশের সাথে এমনভাবে মিশ্রিত করা যাবে যে, এক অংশীদারের দ্রব্য অপর অংশীদারের দ্রব্য থেকে পৃথক করা যায় না।[২]

মূল কথা হল, যদি কোন অংশীদার মুশারাকা কারবারে দ্রব্যগত মূলধন দিয়ে অংশীদার হতে চায়, তবে ইমাম মালেক (রহ.)-এর মত অনুযায়ী তিনি বিনা প্রতিবন্ধকতায় অংশীদার হতে পারবেন। তবে উক্ত অংশীদারের অংশের মূল্য অংশীদারিত্ব চুক্তি সম্পাদনের তারিখে দ্রব্যের বাজার মূল্য

১. ইব্‌ন কুদামা, আল-মুগনী, ৫/১২৪-১২৫।
২. থানভী (রহঃ), ইমদাদুল ফাতওয়া।

অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে দ্রব্যগত মূলধনের প্রথম প্রকার তথা সমতুল্য বস্তুকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে, কিন্তু মূল্যনির্ভর বস্তুকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে দ্রব্য যদি সমতুল্য বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে তা পুঁজির অংশ ঐ ক্ষেত্রে হতে পারবে, যে ক্ষেত্রে প্রত্যেক অংশীদারের দ্রব্য অপরের দ্রব্যের সাথে মিশ্রণ করা যাবে। আর যদি দ্রব্য মূল্যনির্ভর বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে তা মুশারাকায় পুঁজির অংশ হতে পারবে না।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইমাম মালেক (রহ.)-এর মত অধিক সহজ এবং যুক্তিসঙ্গত মনে হয় এবং তা আধুনিক ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজন পূরণ করে। তাই এর উপর আমল করা যেতে পারে।[১]

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, মুশারাকার মূলধন নগদেও হতে পারে এবং দ্রব্যের আকারেও হতে পারে। তবে দ্রব্যের ক্ষেত্রে দ্রব্যের বাজার দর অনুযায়ী মূলধনে অংশীদারের অংশ নির্ধারণ করা হবে।

## মুশারাকার ব্যবস্থাপনা

মুশারাকার (অংশীদারী কারবার) সাধারণ নিয়ম-নীতি হল, প্রত্যেক অংশীদার-এর (Management) ব্যবস্থাপনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং কাজ করার অধিকার রাখে। তবে অংশীদারগণ এ শর্তেও একমত হতে পারে যে, তাদের মধ্য থেকে যে কোন একজনের উপর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকবে, অপর কোন অংশীদার মুশারাকার জন্য কাজ করবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় অংশীদারগণ (Sleeping partner) তাদের বিনিয়োগকৃত পুঁজির অনুপাত অপেক্ষা অধিক লাভ পাবে না, বরং পুঁজির পরিমাণ অনুপাতে পাবে। যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

১. ইব্‌ন কুদামা, আল-মুগনী, ৫/১২৪-১২৫।



যদি সকল অংশীদার যৌথ কারবার ব্যবস্থাপনায় সক্রিয়ভাবে কাজ করতে একমত হয়, তবে ব্যবসার সকল বিষয়ে তাদের প্রত্যেকেই একে অপরের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হবে এবং ব্যবসার সাধারণ অবস্থায় অংশীদারদের যে কেউ যে কোন কাজ করবে, তার ব্যাপারে এ কথা ধরে নেওয়া হবে যে, অন্য অংশীদারগণও তাতে অনুমতি দিয়েছে।

## মুশারাকা (অংশীদারী কারবার) বিলুপ্ত করা

নিম্নোল্লেখিত যে কোন অবস্থায় মুশারাকা কারবার বিলুপ্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

(১) প্রত্যেক অংশীদারের যে কোন সময় অপর অংশীদারকে নোটিশ প্রদান করে মুশারাকা বিলুপ্ত করার অধিকার রয়েছে। এ ধরণের নোটিশের মাধ্যমে মুশারাকা কারবার বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

এক্ষেত্রে মুশারাকার সমুদয় সম্পদ যদি নগদ তরল আকৃতির হয়, তাহলে তা অংশীদারদের মাঝে তাদের অংশ অনুপাতে বণ্টন করা হবে। আর সম্পদ যদি তরল প্রকৃতির না হয়, তাহলে অংশীদারগণ দু'টি পদ্ধতির যে কোন একটি অবলম্বন করতে পারে। হয়ত দ্রব্যগত সম্পদকে তারল্য করে (অর্থাৎ- বিক্রি করে মুদ্রায় রূপান্তরিত করে) অথবা দ্রব্যগত সম্পদকেই পরস্পরে বণ্টন করে নিবে। যদি এ ব্যাপারে অংশীদারদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়, যেমন- কোন অংশীদার সমুদয় সম্পদকে তরল আকৃতিতে (Liquidation) রূপান্তরিত করতে চায়, অপরদিকে অন্য অংশীদার হুবহু দ্রব্যগত সম্পদকেই বন্টন করতে চায়, তাহলে শেষোক্ত (দ্রব্যগত সম্পদ বন্টনের) দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রাধান্য দেয়া হবে। কেননা, মুশারাকা বিলুপ্তির পর সমুদয় সম্পদে অংশীদারদের যৌথ মালিকানা থাকে। আর যৌথ মালিকানাধীন সম্পদের ব্যাপারে প্রত্যেক অংশীদারের জন্য ঐ দ্রব্যটি হুবহু বণ্টন বা স্বীয় অংশ পৃথকের দাবী করার অধিকার রয়েছে। কেউ তাকে তারল্য (Liquidation) করার প্রতি চাপ প্রয়োগ

করতে পারে না। তবে সম্পদ যদি এমন হয়, যে গুলোকে পৃথক করে বণ্টন করা যায় না, যেমন- মেশিনারী দ্রব্য। সে ক্ষেত্রে ঐ সম্পদকে বিক্রি করে বিক্রিলব্ধ অর্থ অংশীদারদের মাঝে বণ্টন করা হবে।[১]

(২) মুশারাকা চলাকালীন যদি কোন অংশীদারের মৃত্যু হয়, তাহলে মৃত ব্যক্তির অংশীদারিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে মৃতের উত্তরাধিকারীগণ ইচ্ছা করলে তার অংশীদারিত্ব উঠিয়ে নিতে পারবে, অথবা মুশারাকা চুক্তি অব্যাহত রাখতে পারবে।

(৩) অংশীদারদের কেউ যদি পাগল বা উম্মাদ হয়ে যায়, কিংবা কোন কারণে ব্যবসায়িক চুক্তির যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে, তাহলে মুশারাকা বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

## ব্যবসা বিলুপ্ত না করে মুশারাকা বিলুপ্ত করা

যদি কোন অংশীদার মুশারাকা বিলুপ্ত করতে চায়, অপরদিকে অন্য অংশীদার বা অংশীদারগণ ব্যবসা অব্যাহত রাখতে চায়, তাহলে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে তা করা যেতে পারে। যে সকল অংশীদার ব্যবসা অব্যাহত রাখতে ইচ্ছুক, তারা বিলুপ্তকারী অংশীদারের অংশ ক্রয় করে নিবে। কেননা, কোন অংশীদারের মুশারাকা বিলুপ্তি করার অর্থ এটা নয় যে, এই মুশারাকা কারবার অন্যান্য অংশীদারের সাথেও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।[২]

এরূপ ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব বিলুপ্তকারীর অংশের মূল্য পারস্পরিক আলোচনা ও সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারণ করা জরুরী। যদি উক্ত অংশীদারের মূল্য নির্ধারণে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং অংশীদারদের সর্বসম্মতিক্রমে কোন মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে মুশারাকা প্রত্যাহারকারী অংশীদার স্বয়ং ব্যবসার পণ্যসামগ্রী (যেভাবে আছে

১. ইব্‌ন কুদামা, আল-মুগনী, ৫/১৩৩-১৩৪।
২. প্রাগুক্ত।



সেভাবেই) বণ্টন করে; অথবা পণ্যসামগ্রী বিক্রি করত তারল্যে রূপান্তরিত করে তার অংশ নিয়ে অন্যান্য অংশীদার থেকে পৃথক হয়ে যেতে পারবে।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, মুশারাকায় চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে অংশীদারগণ এ শর্তারোপ করতে পারবে কি না যে, সকল অংশীদার বা অধিকাংশ অংশীদারের সম্মতি ব্যতীত ব্যবসার সম্পদ বন্টন কিংবা তরল আকৃতিতে রূপান্তরিত করা যাবে না এবং কোন একক অংশীদার অংশীদারিত্ব থেকে পৃথক হতে চাইলে তার অংশ অন্য অংশীদারের নিকট বিক্রি করে দিতে হবে। ব্যবসার সম্পদ বণ্টন বা তরল আকৃতিতে রূপান্তরিত করার জন্য তিনি অন্যান্য অংশীদারকে বাধ্য করতে পারবেন না।

ইসলামী ফিক্‌হের গ্রন্থাবলীতে এ প্রশ্নের ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে বাহ্যিকভাবে শরীয়তের দৃষ্টিতে এতে কোন অসুবিধা নেই। বরং অংশীদারগণ মুশারাকা চুক্তির শুরু লগ্নে এ ধরনের শর্তে আবদ্ধ হতে পারবে। কোন কোন হাম্বলী ফকীহগণ এ ধরনের শর্তে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট অনুমতি দিয়েছেন।[১]

এই নতুন শর্তটি বিশেষত আধুনিক প্রেক্ষাপটে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রতীয়মান হয়। কেননা, বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবসায় সফলতার জন্য অংশীদারিত্ব অব্যাহত রাখার দাবী করে। শুধুমাত্র একজন অংশীদারের দাবীর প্রেক্ষিতে ব্যবসার সম্পদ তরল আকৃতিতে রূপান্তর বা বণ্টন করার দ্বারা অন্য অংশীদারদের অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হয়ে যেতে পারে।

একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে যদি কোন ব্যবসা শুরু করা হয় এবং প্রকল্পের শৈশবকালেই অংশীদারদের কোন একজন সম্পদের তারল্য চায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে তাকে বিনা কারণে সম্পদের তারল্য বা বণ্টনের স্বাধীনতা প্রদান করা অন্য অংশীদারদের উন্নয়নের জন্য এমনিভাবে মারাত্মক ক্ষতি হবে যেমনিভাবে সমাজের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য ক্ষতিকারক হয়। তাই এ ধরনের শর্ত ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হয়। এধরনের শর্তারোপের সমর্থনে একটি মূলনীতিও রয়েছে,

১. ইব্‌ন কুদামা, আল-মুগনী, ৫/১৩৩-১৩৪।

যে মূলনীতিটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণনা করেছেন-

المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما او حرما حلالا

"মুসলমানদের যাবতীয় বিষয় তাদের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে আরোপিত শর্ত অনুযায়ীই হয়ে থাকে, তবে সে শর্ত ব্যতীত যা হালালকে হারাম করে বা হারামকে হালাল করে।" (আবু দাউদ, হাদীস নং-৩৫৫৫) [১]

এ যাবৎ "শিরকাতুল আমওয়াল" বা "মুশারাকা"-এর মৌলিক ও প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে মুশারাকার এমন কিছু মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই, যা বর্তমান যুগের বৈধ পন্থায় আধুনিক অর্থায়ন পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে এ আলোচনাটি "মুদারাবা" (Mudarabah)-এর প্রাথমিক আলোচনার পর করা অধিক যৌক্তিক মনে করি। যা (মুদারাবা) লভ্যাংশে অংশীদারিত্বের আরেকটি প্রধান ও আদর্শিক অর্থায়ন পদ্ধতি। যেহেতু মুশারাকা এবং মুদারাবা পদ্ধতিতে অর্থায়নের বিধি-বিধান একই ধরণের এবং বাস্তব প্রয়োগের মূলনীতির দিক দিয়েও উভয়ে সম্পর্কযুক্ত, তাই 'মুশারাকার' বাস্তব প্রয়োগের মূলনীতির আলোচনার পূর্বে 'মুদারাবার' অর্থায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা অধিক উপকারী মনে করি।

১. ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া, ২/৩৩৫-৩৩৬।

# মুদারাবা
# (Mudarabah)

"মুদারাবা" অংশীদারিত্বের একটি বিশেষ পদ্ধতি। যে অংশীদারিত্বে এক শরীক অপরকে ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য অর্থ সরবরাহ করে। পুঁজি বিনিয়োগ করে প্রথম পক্ষ, তাকে বলা হয় "রাব্বুলমাল" বা "পুঁজি বিনিয়োগকারী" অপরদিকে ব্যবসার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা (Management) এবং কাজের দায়িত্ব দ্বিতীয় পক্ষের উপর, যাকে বলা হয় "মুদারিব" বা "কারবারি"।

মুশারাকা এবং মুদারাবার মাঝে পার্থক্য নিম্ন-বর্ণিত দিকগুলোতে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা যায়।

(১) মুশারাকায় পুঁজি উভয়পক্ষ থেকে সরবরাহ করা হয়। কিন্তু মুদারাবায় পুঁজি বিনিয়োগের দায়িত্ব শুধু রাব্বুল মালের উপর।

(২) মুশারাকায় সকল অংশীদারগণ ব্যবসার জন্য কাজ করতে পারে এবং ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় (Management) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু মুদারাবায় রাব্বুলমাল ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণের কোন অধিকার রাখেনা, বরং তা শুধুমাত্র মুদারিবই আঞ্জাম দিবে।

(৩) মুশারাকায় সকল অংশীদার স্বীয় পুঁজির পরিমাণ অনুপাতে লোকসানে অংশীদার হয়। কিন্তু মুদারাবায় যদি লোকসান হয়, তাহলে তা শুধুমাত্র রাব্বুলমালকেই বহন করতে হবে। কেননা, মুদারিবতো কোন মূলধনই বিনিয়োগ করে না। তার লোকসান শুধুমাত্র এতটুকু যে, শ্রম বিফলে গেল এবং কোন পারিশ্রমিক পেল না।

তবে এই নীতিমালা এ শর্তের সাথে সম্পৃক্ত যে, মুদারিবকে এমন পূর্ণ সতর্কতা এবং দায়িত্বের সাথে কাজ করতে হবে যা সাধারণত ঐ জাতীয় ব্যবসার জন্য জরুরী মনে করা হয়। কিন্তু মুদারিব যদি উদাসীনতা এবং বেপরওয়ার হয়ে কাজ করে বা নীতিবিরোধী কোন আচরণ করে, তাহলে বেপরওয়া এবং অসতর্কতার কারণে ব্যবসায় যে লোকসান হবে তা মুদারিবকে বহন করতে হবে।

(৪) মুশারাকায় সাধারণত অংশীদারদের দায়িত্ব (স্বীয় অংশের সাথে) সীমাবদ্ধ থাকে না। সুতরাং ব্যবসার দায়িত্ব (ঋণ) যদি তার সম্পদের তুলনায় বেশী হয়ে যায় এবং পর্যায়ক্রমে ব্যবসার পণ্যসামগ্রী তারল্যে রূপান্তরিত হয়ে যায়, তাহলে সম্পদ অপেক্ষা অতিরিক্ত দায়িত্ব (ঋণ) অংশীদারগণকে স্বীয় অংশ অনুপাতে বহন করতে হবে। তবে সকল অংশীদার যদি এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, কোন অংশীদার ব্যবসা চলাকালীন সময়ে কোন ঋণ গ্রহণ করবে না, তাহলে এক্ষেত্রে অতিরিক্ত দায়িত্ব (ঋণ) শুধুমাত্র সেই অংশীদারকেই বহন করতে হবে যিনি উল্লেখিত শর্ত লংঘন করে ব্যবসায় ঋণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু মুদারাবায় ব্যাপারটি ভিন্ন ধরনের। মুদারাবায় রাব্বুলমালের দায়িত্ব তার বিনিয়োগকৃত পুঁজির পরিমাণের সাথে সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে রাব্বুলমাল যদি মুদারিবকে তার (রাব্বুলমালের) পক্ষ থেকে ঋণ গ্রহণের অনুমতি দিয়ে থাকে। (তাহলে অতিরিক্ত ঋণের দায়িত্ব রাব্বুলমালকে বহন করতে হবে)।

(৫) মুশারাকায় যখনই অংশীদারগণ স্বীয় পুঁজি মিশ্রণ করে নিবে, তখনই মুশারাকার সমুদয় সম্পদে অংশীদারদের অংশ অনুপাতে তাদের যৌথ মালিকানা হয়ে যাবে। (এবং প্রত্যেকেই সম্পদের প্রত্যেক অংশের মালিক হয়ে যাবে)। ফলে অংশীদারদের প্রত্যেকেই উক্ত সম্পদের মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে লাভবান হতে থাকবে, যদিও তা বিক্রি করে লাভবান হয়নি।

কিন্তু মুদারাবার অবস্থা ভিন্নরূপ। মুদারাবায় ক্রয়কৃত সমুদয় সম্পদের মালিক হয় শুধুমাত্র রাব্বুল্‌মাল। মুদারিব শুধুমাত্র উক্ত সম্পদ লাভে বিক্রি



করার ক্ষেত্রে লভ্যাংশ থেকে স্বীয় অংশ গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং মুদারিব সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি হলেও তাতে স্বীয় অংশের দাবী করার অধিকার রাখে না।

## মুদারাবা ব্যবসা

রাব্বুলমাল মুদারিবকে বিশেষ ধরনের ব্যবসা করা নির্দিষ্ট করে দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে মুদারিবকে শুধুমাত্র রাব্বুলমালের নির্দেশ মুতাবেক ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। এ ধরনের মুদারাবাকে 'মুদারাবা মুক্বাইয়াদা' বলা হয়। পক্ষান্তরে রাব্বুলমাল যদি মুদারিবকে যে কোন ধরনের ব্যবসা করার স্বাধীনতা প্রদান করে, তাহলে মুদারিব ইচ্ছানুযায়ী যে কোন ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করতে পারবে। এ ধরনের মুদারাবাকে 'মুদারাবা মুত্বলাকা' বলা হয়।

একজন রাব্বুল্‌মাল একই চুক্তিতে একাধিক ব্যক্তির সাথে মুদারাবার চুক্তি করতে পারে। অর্থাৎ, রাব্বুলমাল তার পুঁজি 'ক' এবং 'খ' উভয়কে (যৌথভাবে) প্রদান করতে পারে। সুতরাং তাদের প্রত্যেকেই রাব্বুলমালের জন্য মুদারিব হিসেবে কাজ করতে পারবে এবং মুদারাবার মূলধন উভয়ে যৌথভাবে ব্যবহার করবে, মুদারিবের অংশ তাদের উভয়ের মাঝে পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে বণ্টন করা হবে।[১] এক্ষেত্রে উভয় মুদারিব পরস্পরের অংশীদারের ন্যায় ব্যবসার কাজ পরিচালনা করবে।

মুদারিব একজন হোক কিংবা একাধিক হোক, তারা ব্যবসায় ঐ সকল কাজ করতে পারবে, যা সাধারণত এ ধরনের ব্যবসায় করা হয়ে থাকে। কিন্তু মুদারিব যদি এমন কোন অসাধারণ কাজ করতে চায়, যা ব্যবসায়ীগণ সাধারণত করে না, তাহলে তা রাব্বুলমালের সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত করতে পারবে না।

---

১. ইব্‌ন কুদামা, আল-মুগনী, ৫/১৪৫।

## মুনাফা বণ্টন

মুদারাবা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য অন্যতম জরুরী শর্ত হল, কারবার শুরু করার পূর্বেই উভয়পক্ষ প্রকৃত লভ্যাংশ বণ্টনের হার নির্ধারণের ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে, যে অনুযায়ী রাব্বুলমাল এবং মুদারিব উভয়ে লভ্যাংশের পাওনাদার হবে। শরীয়ত লভ্যাংশ বণ্টনের নির্দিষ্ট কোন অনুপাত বর্ণনা করেনি, বরং তা নির্ধারণের ব্যাপারে উভয়পক্ষের স্বাধীন মতামতের উপর ছেড়ে দিয়েছে। তারা লভ্যাংশে সমহারেও অংশীদার হতে পারে কিংবা রাব্বুলমাল এবং মুদারিবের জন্য পৃথক পৃথক অনুপাতও নির্দিষ্ট করতে পারে। তবে তারা কোন পক্ষের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ ধার্য করতে পারবে না। এমনিভাবে কোন পক্ষের মুনাফা মূলধনের কোন আনুপাতিক অংশের সাথেও নির্দিষ্ট করতে পারবে না। উদাহরণস্বরূপ- মূলধন যদি এক লাখ টাকা হয়, তাহলে তারা এ শর্তে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে না যে, সমুদয় মুনাফার দশ হাজার টাকা মুদারিব পাবে এবং এ ধরনের চুক্তিও করতে পারবে না যে, (যেমন) মূলধনের ২০% রাব্বুলমালকে দেয়া হবে। তবে এ চুক্তি করতে পারবে যে, প্রকৃত মুনাফার ৪০% মুদারিব পাবে এবং ৬০% রাব্বুলমাল পাবে, কিংবা ৬০% মুদারিব এবং ৪০% রাব্বুলমাল পাবে।

বিভিন্ন অবস্থায় মুনাফার বিভিন্ন অনুপাত ধার্য করাও জায়েয আছে। যেমন- রাব্বুলমাল মুদারিবকে একথা বলতে পারে যে, তুমি যদি গমের ব্যবসা কর, তাহলে সমুদয় মুনাফার ৫০% পাবে, আর যদি আটার ব্যবসা কর, তাহলে সমুদয় মুনাফার ৩৩% পাবে। এমনিভাবে রাব্বুলমাল একথাও বলতে পারে যে, তুমি যদি নিজ শহরে ব্যবসা কর, তাহলে ৩০% পাবে, আর যদি ভিন্ন শহরে ব্যবসা কর, তাহলে মুনাফায় তোমার অংশ ৫০% হবে।

মুনাফার সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক অংশ ব্যতীত মুদারিব মুদারাবার জন্য কৃত স্বীয় কাজের বিনিময়ে কোন রকম বেতন, ভাতা বা বিনিময়ের দাবী করতে পারবে না।



ফিক্‌হবিদদের সর্বসম্মতিক্রমে মুদারিব পূর্ব সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক হারে মুনাফা ব্যতীত মুদারাবার ব্যবসা পরিচালনার কারণে কোন রকম বেতন, ভাতা বা বিনিময়ের দাবী করতে পারবে না।[১] তবে ইমাম আহমাদ (রহ.) মুদারিবকে মুদারাবা একাউন্ট থেকে শুধুমাত্র দৈনিক খোরাকের খরচ গ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করেন।[২] কিন্তু হানাফী ফিক্‌হবিদদের নিকট মুদারিব মুদারাবা একাউন্ট থেকে দৈনিক খোরাকের খরচ ঐ সময় গ্রহণ করতে পারবে, যখন সে মুদারাবা ব্যবসার জন্য নিজ শহরের বাইরে ভ্রমণ করবে। তখন সে তার থাকা খাওয়া ইত্যাদির খরচ গ্রহণ করতে পারবে। নিজ শহরে থাকাকালীন সময়ে দৈনিক কোন খরচের পাওনাদার হবে না।

যদি মুদারাবার কোন ব্যবসায় লোকসান হয় এবং কোন ব্যবসায় লাভ হয়, তাহলে প্রথমে লাভ দ্বারা লোকসানের ক্ষতিপূরণ করা হবে। ক্ষতিপূরণের পর যা থাকবে, তা উভয়ের মাঝে পূর্ব সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হবে।[৩]

## মুদারাবা সমাপ্ত করা

মুদারাবা চুক্তি উভয়পক্ষের যে কেউ যে কোন সময় অপর পক্ষকে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে সমাপ্ত করতে পারে। সমাপ্তির সময় মুদারাবার সমুদয় সম্পদ যদি তরল আকৃতির হয় এবং মূলধনের বিনিময়ে কিছু মুনাফাও অর্জিত হয়, তাহলে তা উভয়ের মাঝে মুনাফার সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হবে। কিন্তু মুদারাবার সম্পদ যদি তরল আকৃতির না হয়, তাহলে মুদারিবকে মুদারাবার সম্পদ বিক্রি করে তারল্যে রূপান্তরিত করার সুযোগ দেয়া হবে, যাতে প্রকৃত মুনাফা নির্ধারণ করা যায়।[৪]

---

১. বাদায়িউস সানাই, ৫/৯৯।
২. সারাখসী, আল-মাবসূত, ২২/১৪৯-১৫০।
৩. আল-কাসানী, বাদায়িউস সানাই, ৬/১০৯।
৪. ইবন কুদামা, আল-মুগনী, ৫/১৮৬।

মুসলিম ফিক্‌হবিদদের এ প্রশ্নের ব্যাপারে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যে, মুদারাবাকে এমন কোন নির্দিষ্ট মেয়াদের সাথে নির্ধারণ করা যাবে কিনা, যে মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে মুদারাবা চুক্তি নিজে নিজেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। হানাফী এবং হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী মুদারাবাকে সুনির্দিষ্ট মেয়াদের সাথে সীমাবদ্ধ করা যাবে। যেমন, এক বছর, ছয় মাস ইত্যাদি। যার পরে মুদারাবা বিনা নোটিশে সমাপ্ত হয়ে যাবে। অপরদিকে মালেকী এবং শাফেয়ী ফিক্‌হবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি হল মুদারাবাকে নির্দিষ্ট মেয়াদের সাথে সীমাবদ্ধ করা যাবে না।[1]

তবে ফিক্‌হবিদদের এ মতবিরোধ মুদারাবার মেয়াদের সর্বশেষ এবং সর্বোচ্চ সময়সীমার সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু উভয়ের পক্ষ থেকে মুদারাবার এমন কোন সর্বনিম্ন সময়সীমা নির্ধারণ করা যাবে কিনা, যার পূর্বে মুদারাবা চুক্তি সমাপ্ত করা যাবে না? ইসলামী ফিক্‌হের গ্রন্থাবলীতে এ প্রশ্নের ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন উত্তর পাওয়া যায় না। কিন্তু একটি মূলনীতি যা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এ ধরনের কোন সময়সীমা নির্ধারণ করা যাবেনা। বরং উভয়পক্ষের যে কেউ যখন ইচ্ছা করবে মুদারাবা চুক্তি সমাপ্ত করতে পারবে।[2]

উভয়পক্ষের মুদারাবা সমাপ্তি করার এই অসীম স্বাধীনতা বর্তমান যুগে কিছু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। কেননা, বর্তমানে অধিকাংশ ব্যবসা-বাণিজ্যে সফলতা দেখানোর জন্য বেশ কিছু সময়, দৃঢ়সংকল্প ও স্থিরচিত্তসম্পন্ন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। এ কারণে রাব্বুলমাল যদি ব্যবসার একেবারেই শুরুলগ্নে মুদারাবা সমাপ্ত করে দেয়, তাহলে তা এই প্রকল্পের জন্য বিরাট জটিলতার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। বিশেষ করে মুদারিবের জন্য মারাত্মক ক্ষতি হবে, কেননা সে সার্বিক প্রচেষ্টা ব্যয় করার পরও কোন কিছু অর্জন করতে পারেনি। এজন্য মুদারাবা চুক্তির প্রারম্ভেই যদি উভয়পক্ষ এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, কোন পক্ষ একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত বিশেষ কোন সমস্যা ব্যতীত মুদারাবাকে সমাপ্ত করবেনা,

১. আল-কাসানী, বাদায়িউস সানাই, ৬/১৯৯, ইবন কুদামা, আল-মুগনী, ৫/১৮৫, ৪.
২. সারাখসী, আল-মাবসূত, ২২/১৩৩।



তাহলে এ শর্তটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে শরীয়তের কোন মূলনীতির পরিপন্থি বলে মনে হয় না। বিশেষত ঐ হাদীসের আলোকে যা পূর্বেও উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যে, المسلمون على شروطهم إلا أحل حراما أو حرم حلالا "মুসলমানদের মাঝে সিদ্ধান্তকৃত শর্তকে স্থির রাখা হবে, কিন্তু ঐ শর্ত যা কোন হারামকে হালাল করে বা হালালকে হারাম করে।"

(আবু দাঊদ, হাদীস নং- ৩৫৫৫)।

## মুশারাকা এবং মুদারাবার সমন্বয়

সাধারণ অবস্থায় এটাই মনে করা হয় যে, মুদারিব মুদারাবায় কোন পুঁজি বিনিয়োগ করে না, সে শুধু ব্যবস্থাপনার যিম্মাদার, সমুদয় পুঁজি রাব্বুলমাল বিনিয়োগ করে। কিন্তু এমন অবস্থাও হতে পারে যে, মুদারিবও তার কিছু পুঁজি মুদারাবা ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে চায়, এ ক্ষেত্রে মুশারাকা এবং মুদারাবা চুক্তিদ্বয় একত্রিত হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ- 'A' 'B' কে মুদারাবার ভিত্তিতে এক লাখ টাকা প্রদান করল। অতঃপর 'B' 'A' এর সম্পতিতে নিজের পক্ষ থেকে আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা মুদারাবায় সংযুক্ত করল। এ জাতীয় অংশীদারিত্বের সাথে মুশারাকা এবং মুদারাবার সমন্বিত মু'আমালা করা হবে। এখানে মুদারিব নিজের জন্য অংশীদার হিসেবে মুনাফার বিশেষ একটি অংশ ধার্য করতে পারবে। এর সাথে সাথে সে মুদারিব হিসেবে মুদারাবার ব্যবস্থাপনা এবং পরিশ্রমের কারণে মুনাফার আরেকটি অংশ ধার্য করতে পারবে। উল্লেখিত উদাহরণে মুনাফা এ ভিত্তিতে নির্ধারণ হবে যে, 'B' প্রকৃত মুনাফার এক তৃতীয়াংশ স্বীয় পুঁজির কারণে পাবে, অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ মুনাফা উভয়ের মাঝে সমহারে বণ্টন হবে, কিন্তু (এই দুই তৃতীয়াংশ বণ্টনে) উভয়পক্ষ অন্য কোন আনুপাতিক হারের উপরও চুক্তিবদ্ধ হতে পারে। তবে এতটুকু শর্ত যে, নিষ্ক্রিয় অংশীদার (Sleeping Partner) স্বীয় পুঁজির অনুপাত অপেক্ষা বেশি গ্রহণ করতে পারবে না। সুতরাং উল্লেখিত উদাহরণে 'A' নিজের জন্য সমুদয় মুনাফার দুই তৃতীয়াংশের অধিক ধার্য করতে পারবে না। কেননা, তার বিবিয়োগকৃত পুঁজি সমুদয় পুঁজির দুই তৃতীয়াংশের অধিক নয়।

## মুশারাকা এবং মুদারাবা পদ্ধতিতে অর্থায়ন

পূর্বের অনুচ্ছেদসমূহে মুশারাকা এবং মুদারাবার প্রাচীন ধারণা এবং সে অনুযায়ী শরয়ী বিধানাবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আধুনিক ব্যবসা বাণিজ্যে এ দু'টি পদ্ধতিকে অর্থায়ন (Financing) -এর উদ্দেশ্যে কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে সে বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে করি।

ইসলামী ফিকহের গ্রন্থাবলীতে মুশারাকা এবং মুদারাবার স্বরূপ এ চিন্তা-চেতনার ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে যে, এ দু'টি চুক্তি এমন যৌথ কারবার শুরু করার জন্য যেখানে উভয়পক্ষ একেবারে শুরু থেকেই ব্যবসায় অন্তর্ভুক্ত হয় এবং একেবারে শেষ পর্যন্ত তথা সম্পদ তরল আকৃতিতে রূপান্তর করা পর্যন্ত অংশীদার থাকে। ইসলামী ফিক্‌হের প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে এ ধরনের চলমান ব্যবসার বর্ণনা পাওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার, যেখানে অংশীদারগণ ব্যবসার চলমান অবস্থায় কোন রকম জটিলতা সৃষ্টি ব্যতীত অংশীদার হয় এবং পৃথক হয়ে যায়। বস্তুত ইসলামী ফিক্‌হের প্রাচীন গ্রন্থাবলী এমন পরিবেশে লিখা হয়েছে যেখানে বড় ধরনের কোন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলন ছিল না এবং বর্তমান যুগের ন্যায় তৎকালীন ব্যবসা-বাণিজ্যে এত জটিলতাও ছিল না। যার ফলে পূর্ববর্তী মনীষীগণ এ ধরনের প্রচলিত ব্যবসার সমাধানের প্রতি মনোনিবেশ করেননি। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, মুশারাকা এবং মুদারাবাকে চলমান ব্যবসার অর্থায়নের জন্য ব্যবহার করা যায় না। মুশারাকা এবং মুদারাবার পদ্ধতি যেসব বুনিয়াদী মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেসব মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে কালের পরিবর্তনে সেগুলোর প্রয়োগের প্রক্রিয়া পরিবর্তন করা যেতে পারে।

বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে সেসব বুনিয়াদী মূলনীতির প্রতি আমাদের একটু দৃষ্টিপাত করা উচিত।

(১) মুশারাকা এবং মুদারাবার মাধ্যমে অর্থায়ন ঋণ হিসেবে অর্থ প্রদানের সদৃশ্য নয়। বরং মুশারাকার পদ্ধতিতে অর্থায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিনিয়োগকৃত পুঁজির অনুপাতে ঐ ব্যবসার সম্পদে অংশীদার হওয়া।



(২) বিনিয়োগকারী/অর্থযোগানদাতা তার পুঁজির অনুপাতে ব্যবসার লোকসানেও অবশ্যই অংশীদার হতে হবে।

(৩) অংশীদারদের এ স্বাধীনতা রয়েছে যে, তারা তাদের পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে প্রত্যেকের জন্য মুনাফার অনুপাত সাব্যস্ত করতে পারে। তবে যে অংশীদার সুস্পষ্টভাবে নিজেকে ব্যবসার জন্য কাজ করার দায়িত্ব থেকে পৃথক করে নেয়, সে তার পুঁজির অনুপাত অপেক্ষা অধিক মুনাফার দাবী করতে পারে না।

(৪) লোকসান প্রত্যেককেই তাদের পুঁজির অনুপাতে বহন করতে হবে।

এসব মূলনীতিকে সামনে রেখে মুশারাকা এবং মুদারাবাকে অর্থায়নের বিভিন্ন অধ্যায়ে কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, এ পর্যায়ে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করব।

### প্রকল্প অর্থায়ন ঃ (Project Financing)

প্রকল্প অর্থায়ন (Project Financing)-এর জন্য মুশারাকা এবং মুদারাবার প্রাচীন পদ্ধতি খুব সহজতার সাথে অবলম্বন করা যায়। পুঁজি বিনিয়োগকারী (Financier) যদি (এককভাবে) পূর্ণ প্রজেক্টে পুঁজি বিনিয়োগ করতে চায়, তাহলে মুদারাবা পদ্ধতি গ্রহণ করবে। আর উভয়পক্ষ পুঁজি বিনিয়োগ করলে মুশারাকা পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। পুঁজি উভয়পক্ষ বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা যদি এক পক্ষের দায়িত্বে থাকে, তাহলে পূর্বোল্লেখিত নিয়মানুযায়ী মুশারাকা এবং মুদারাবার সমন্বিত পদ্ধতি গ্রহণ করবে।

যেহেতু মুশারাকা এবং মুদারাবা প্রকল্পের একেবারে প্রথম থেকেই কার্যকর হবে, তাই পুঁজির মূল্য নির্ধারণের সমস্যাও সামনে আসবেনা। এমনিভাবে সাধারণ হিসাব-নিকাশের নিয়ম-নীতি (Accounting Standards) অনুযায়ী মুনাফা বণ্টনেও কোন সমস্যা হবে না। তবে পুঁজি বিনিয়োগকারী (Financier) যদি মুশারাকা থেকে পৃথক হয়ে যেতে চায়

এবং দ্বিতীয় পক্ষ ব্যবসা চালু রাখতে চায়, তাহলে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের অংশ পারস্পরিক আলোচনা সাপেক্ষে মূল্য নির্ধারণ করত ক্রয় করতে পারবে। এভাবে পুঁজি বিনিয়োগকারী লভ্যাংশসহ তার বিনিয়োগকৃত পুঁজি ফেরত নিতে পারে। ব্যবসায় যদি কিছু মুনাফা অর্জন হয়, তাহলে তার অংশের মূল্য কিসের ভিত্তিতে নির্ধারণ হবে এ বিষয়টি সামনে ওয়ার্কিং ক্যাপিট্যালের অর্থায়নের আলোচনায় আসবে।

অপরদিকে ব্যবসায়ী (পুঁজি ব্যবহারকারী) ইচ্ছা করলে তার প্রজেক্ট চালু রাখতে পারে। হয়ত নিজের মালিকানায় রেখে কিংবা প্রথম অর্থায়নকারীর অংশ অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে। অন্যের নিকট বিক্রির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পুঁজি বিনিয়োগকারী প্রথম বিনিয়োগকারীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে।

যেহেতু অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান (Financial Institution) সাধারণত দীর্ঘ মেয়াদের জন্য বিশেষ কোন প্রজেক্টে অংশীদার থাকতে চায় না, এজন্য উল্লেখিত পন্থানুযায়ী উক্ত প্রতিষ্ঠান স্বীয় অংশ প্রজেক্টের অন্যান্য অংশীদারদের নিকট বিক্রি করতে পারবে। যদি প্রজেক্টে তরল আকৃতির পুঁজি অর্থাৎ নগদ অর্থের স্বল্পতার কারণে তা একসঙ্গে বিক্রি করা সম্ভব না হয়, তাহলে অর্থায়নকারীর অংশকে ছোট ছোট ইউনিটে ভাগ করে কিছুদিন পর পর সময়মত বিক্রি করা যায়। যখন একটি ইউনিট বিক্রি হয়ে যাবে, তখন বিনিয়োগকারী (Financier) -এর সে পরিমাণ অংশ প্রজেক্ট থেকে কমে যাবে। এভাবে যখন সকল ইউনিট বিক্রি হয়ে যাবে তখন অর্থায়নকারী প্রজেক্ট থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে যাবে।

## মুশারাকাকে আদান-প্রদান যোগ্য ডকুমেন্টে রূপান্তরিত করা ঃ
## (Securitization of Musharakah)

মুশারাকা এমন একটি অর্থায়ন পদ্ধতি, যাকে সহজেই সিকিউরিটাইজ করা যায়। (অর্থাৎ আদান-প্রদান যোগ্য ডকুমেন্টে রূপান্তরিত করা যায়)। বিশেষ করে এমন বৃহদায়তনের প্রজেক্ট যেখানে প্রচুর পরিমাণ অর্থের



প্রয়োজন হয়, যা সীমিত সংখ্যক লোক যোগান দিতে পারে না। (ফলে উদ্যোক্তারা পুঁজি গঠনের জন্য ৫০/১০০ টাকা করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত করে শেয়ার হিসেবে বিক্রির জন্য ছাড়ে) প্রত্যেক অর্থ প্রদানকারীকে একটি "মুশারাকা সার্টিফিকেট" প্রদান করা হয়, যে সার্টিফিকেট পরিশোধিত মূলধন অনুপাতে মুশারাকার সমুদয় সম্পদে প্রতিনিধিত্ব করে। যখন জড় সম্পদ এবং দ্রব্যগত সম্পদ সংগ্রহ করে ব্যবসার প্রজেক্ট শুরু হয়ে যাবে, তখন ঐ "মুশারাকা সার্টিফিকেটসমূহ" আদান-প্রদানযোগ্য ডকুমেন্টের মর্যাদায় উপনীত হয়ে যাবে এবং সেগুলোকে শেয়ার মার্কেটে বেচাকেনা করা যাবে। কিন্তু এসব সার্টিফিকেটের ব্যবসা মুশারাকার সমুদয় সম্পদ তরল আকৃতি (অর্থাৎ-নগদ টাকা-পয়সা, উসূলযোগ্য ঋণ, অন্যকে প্রদানকৃত ঋণের টাকা) থাকাকালীন জায়েয হবে না।

উক্ত বিষয়টি যথাযথভাবে বুঝার জন্য একথা স্মরণ রাখা জরুরী যে, মুশারাকায় পুঁজি বিনিয়োগ করা ঋণের সাদৃশ্য নয়। কোন ঋণের প্রমাণপত্র হিসেবে জারীকৃত বন্ডের ঋণকৃত অর্থ দ্বারা পরিচালিত ব্যবসার সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না। এই বন্ড শুধুমাত্র ঐ ঋণের প্রতিনিধিত্ব করে যার বাহককে সর্বাবস্থায় সাধারণত সুদসহ ফেরৎ দেয়া হয়। পক্ষান্তরে মুশারাকা সার্টিফিকেট প্রজেক্টের সম্পদে বাহকের সরাসরি আনুপাতিক একটি অংশের মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে। যদি যৌথ প্রজেক্টের সমুদয় সম্পদ তরল আকৃতির হয়, তাহলে উক্ত সার্টিফিকেট প্রজেক্টের মালিকানাধীন অর্থের একটি বিশেষ আনুপাতিক অংশের প্রতিনিধিত্ব করবে। উদাহরণস্বরূপ- একশ' সার্টিফিকেট ছাড়া হল, যার প্রতিটির মূল্য এক মিলিয়ন টাকা। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রজেক্টের সমুদয় মূলধন হল একশ' মিলিয়ন টাকা। যদি এ অর্থ দ্বারা কোন প্রকার দ্রব্যগত সম্পদ ক্রয় না করা হয়, তাহলে প্রতিটি সার্টিফিকেট এক মিলিয়ন টাকার প্রতিনিধিত্ব করবে। এমতাবস্থায় এই সার্টিফিকেটকে শুধুমাত্র গায়ের মূল্য (এক মিলিয়ন টাকা)-এর বিনিময়েই বিক্রি করা যাবে। কেননা, যদি একটি সার্টিফিকেটকে এক মিলিয়ন টাকা অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রি করা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে এক মিলিয়ন টাকা, এক মিলিয়ন টাকার অধিক

মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে যার অনুমতি নেই। কারণ, যখন টাকার বিনিময়ে টাকা বিক্রি করা হয়, তখন উভয় দিকে টাকার পরিমাণগত সমতা রক্ষা করা জরুরী। যে কোন পক্ষ থেকে টাকার পরিমাণ বেশি পরিশোধ করা হলে তা সুদ হয়ে যাবে।

কিন্তু যৌথ মূলধন দ্বারা যখন দ্রব্যগত সম্পদ যেমন- যমিন, বিল্ডিং, মেশিনারী, জড় সম্পদ এবং ফার্নিচার ইত্যাদি ক্রয়ে বিনিয়োগ করা হবে, তখন মুশারাকা সার্টিফিকেট ঐ সম্পদসমূহে সার্টিফিকেট হোল্ডারের পরিশোধিত মূলধন অনুপাতে মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করবে। সুতরাং উল্লেখিত উদাহরণে একটি সার্টিফিকেট ঐ সম্পদসমূহের একশ' ভাগের এক ভাগের (১০০/১) প্রতিনিধিত্ব করবে। এমতাবস্থায় উক্ত সার্টিফিকেটকে শেয়ার মার্কেটে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিক্রমে যে কোন মূল্যে বিক্রি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে। এ মূল্য শেয়ারের লিখিত মূল্য (Face Value) থেকেও অধিক হতে পারবে। কেননা, এক্ষেত্রে যে জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে তা দ্রব্যগত এবং জড় সম্পদের একটি অংশ। শুধু মুদ্রা বা টাকা পয়সা নয়। সুতরাং উক্ত সার্টিফিকেটকে অন্যান্য যে কোন দ্রব্যগত সম্পদের ন্যায় মনে করে লাভ লোকসানের ভিত্তিতে (কম বেশিতে) বিক্রি করা যাবে।

অধিকাংশ সময় প্রজেক্টের সম্পদ তরল এবং দ্রব্যগত-এর সংমিশ্রণ হয়। এরূপ তখন হয়, যখন সক্রিয় অংশীদার (Working Partner) যৌথ মূলধনের একটি অংশকে জড় সম্পদ বা কাঁচা মালে রূপান্তরিত করে ফেলে এবং অবশিষ্ট মূলধন তরল আকৃতির থেকে যায়। অথবা মূলধনকে দ্রব্যগত সম্পদে রূপান্তরিত করার পর তার থেকে কৃয়দাংশ সম্পদ বিক্রি করে কিছু নগদ অর্থ সংগ্রহ করে নেয়। কোন কোন অবস্থায় এমনও হতে পারে যে, ঐ দ্রব্যগত সম্পদ বাকিতে বিক্রি করার কারণে মূল্য এখনো উসূল হয়নি, তবে উসূলযোগ্য। সেই উসূলযোগ্য অর্থ ঋণ হওয়ার কারণে তরল আকৃতির সম্পদ মনে করা হবে। এক্ষেত্রে যখন কোন প্রজেক্টের সম্পদ তরল আকৃতির (নগদ অর্থ) এবং দ্রব্যগত সম্পদের বমিশ্রণ হয়, তখন তার শর্‌য়ী দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে প্রশ্ন উঠে যে, এমন প্রজেক্টের মুশারাকা



সার্টিফিকেটের ব্যবসা করা যাবে কিনা? এই বিষয়ে সমকালীন ফিক্‌হবিদদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। পূর্ববর্তী শাফে'য়ী ফিক্‌হবিদদের মতে এ ধরনের সার্টিফিকেটকে বিক্রি করা যাবে না। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল, যেখানে তরল আকৃতির সম্পদ এবং দ্রব্যগত সম্পদের বিমিশ্রণ হবে, সেখানে ততক্ষণ পর্যন্ত বেচাকেনা করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পদের দ্রব্যগত অংশকে পৃথক করে তা আলাদাভাবে বিক্রি না করা হবে।[১]

হানাফী ফিক্‌হবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি হল, তরল এবং দ্রব্যগত বমিশ্রিত সম্পদকে বিক্রি করা যাবে। তবে শর্ত হল, ধার্যকৃত মূল্য সমুদয় সম্পদের অন্তর্ভুক্ত তরল সম্পদের মূল্যমান থেকে অধিক হতে হবে। যাতে একথা মনে করা যায় যে, মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় তার সমপরিমাণ মুদ্রার বিনিময়ে হয়েছে এবং অতিরিক্ত অর্থ ব্যবসার মালিকানাধীন বিদ্যমান দ্রব্যগত সম্পদের মূল্য।

উদাহরণস্বরূপ- মুশারাকা প্রজেক্টের ৪০% সম্পদ দ্রব্যগত, অর্থাৎ- মেশিনারি, স্থাবর সম্পত্তি ইত্যাদি। ৬০% সম্পদ তরল আকৃতির, অর্থাৎ- নগদ ক্যাশ এবং উসূলযোগ্য অর্থ। এ প্রজেক্টের একশ' টাকা মূল্যমানের সার্টিফিকেট ৬০ টাকার তরল এবং ৪০ টাকার দ্রব্যগত সম্পদের প্রতিনিধিত্ব করে। উক্ত সার্টিফিকেটকে ৬০ টাকার অধিক যে কোন মূল্যে বিক্রি করা যাবে। যদি তাকে ১১০ টাকায় বিক্রি করা হয়, তার অর্থ দাঁড়াবে ৬০ টাকা সার্টিফিকেটের তরল ৬০ টাকার বিনিময়ে এবং অবশিষ্ট ৫০ টাকা দ্রব্যগত সম্পদের আনুপাতিক অংশের বিনিময়ে। কিন্তু এ সার্টিফিকেটকে ৬০ টাকা বা তার চেয়ে কম মূল্যে বিক্রি করা অবশ্যই জায়েয হবে না। কেননা, এক্ষেত্রে অবশিষ্ট দ্রব্যগত সম্পদকে পৃথক করত ৬০ টাকাকে ৬০ টাকার বিনিময়ে ধরা যাচ্ছে না। (যেহেতু দ্রব্যগত সম্পদের বিনিময়ে ঐ ৬০ টাকার কিছু অংশ অবশ্যই এসে যাবে) যার ফলে ৬০ টাকার বিনিময়ে আর ৬০ টাকা থাকবে না।

---

১. আল-খাত্ত্বাবী, মাআলিমুস সুনান, ৫/২৩।

হানাফী মাযহাব অনুযায়ী মিশ্র সম্পদে দ্রব্যগত সম্পদের বিশেষ কোন আনুপাতিক হার নির্দিষ্ট নেই। সুতরাং যদি দ্রব্যগত সম্পদ মিশ্র সম্পদের ৫০% থেকে কমও হয়, তাহলেও উল্লেখিত নিয়মানুযায়ী তার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে।

তবে শাফে'য়ী ফিক্হবিদ এবং অধিকাংশ সমকালীন ফিক্হবিদ ব্যবসার দ্রব্যগত সম্পদ ৫০% থেকে বেশি হওয়ার ক্ষেত্রে ঐ ইউনিটসমূহের ক্রয়-বিক্রির অনুমতি প্রদান করেন।

সুতরাং মুশারাকা সার্টিফিকেটের ব্যবসা সকল ফিক্হবিদদের নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য জরুরী হল- মুশারাকার দ্রব্যগত সম্পদ মিশ্র সম্পদের (Portfolio) ৫০% থেকে অধিক হতে হবে। কিন্তু যদি শুধু হানাফী মাযহাব অনুযায়ী আমল করা হয়, তাহলে দ্রব্যগত সম্পদ ৫০% থেকে কম হওয়ার ক্ষেত্রেও এর ব্যবসা করা জায়েয হবে। তবে এই দ্রব্যগত সম্পদ এত স্বল্প না হতে হবে যা একেবারেই অনুল্লেখযোগ্য।

## এক চুক্তির অর্থায়ন ঃ (Financing of Single Transaction)

মুশারাকা এবং মুদারাবা একই চুক্তির অর্থায়নের জন্য খুব সহজেই ব্যবহৃত হতে পারে। ছোটখাট ব্যবসায়ীদের দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণ করা ছাড়াও মুশারাকা এবং মুদারাবাকে আমদানি এবং রফতানির অর্থায়নের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। একজন আমদানিকারক (Importer) (রফতানিকারকের সাথে) চুক্তিকৃত অর্থ পরিশোধের জন্য যে কোন অর্থায়নকারী (financier) -এর নিকট মুশারাকা এবং মুদারাবার ভিত্তিতে অর্থায়নের জন্য আবেদন করতে পারে। ব্যাংকও এ দু'টি পদ্ধতি (মুশারাকা এবং মুদারাবা)কে আমদানির অর্থায়ন (Import Financing)-এর জন্য ব্যবহার করতে পারে। এলসি যদি জিরো মার্জিনে খোলা হয়, তাহলে মুদারাবা পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে, আর যদি এলসি আংশিক মার্জিনে খোলা হয়, তাহলে শুধু মুশারাকা কিংবা মুদারাবা এবং মুশারাকার সমন্বিত পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে। আমদানিকৃত পণ্য বন্দর থেকে খালাস করার পর সেগুলোর বিক্রিলব্ধ অর্থ আমদানিকারক এবং অর্থায়নকারীর মাঝে পূর্ব সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হবে।



এক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্য অর্থায়নকারীর বিনিয়োগকৃত পুঁজির অনুপাতে তার মালিকানায় থাকবে। এই মুশারাকাকে একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্তও সীমাবদ্ধ করা যায়। যদি সেই নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আমদানিকৃত পণ্য বিক্রি না হয়, তাহলে আমদানিকারক নিজে অর্থায়নকারীর অংশ ক্রয় করে এককভাবে ঐ পণ্যের মালিক হয়ে যাবে। কিন্তু এ অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় ও বাজার মূল্য অনুযায়ী, অথবা বিক্রির দিন উভয়ের মাঝে সাব্যস্তকৃত মূল্যে হতে হবে। মুশারাকায় অর্ন্তর্ভুক্তির সময় যে মূল্য ধার্য করা হয়েছিল, সে মূল্যে বিক্রি করা সঠিক হবে না। মূল্য যদি পূর্বেই সাব্যস্তকৃত হয়, তাহলে অর্থায়নকারী নিজ গ্রাহক আমদানিকারককে তা ক্রয়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারবে না।

এমনিভাবে রফতানির অর্থায়ন (Export Financing)-এর জন্যও মুশারাকা পদ্ধতি খুব সহজভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। যে মূল্যে পণ্য রফতানি করা হবে তা পূর্বেই জানা থাকার কারণে অর্থায়নকারী (Financier) প্রত্যাশিত মুনাফার ধারণা খুব সহজেই উপলব্ধি করতে পারে এবং মুশারাকা ও মুদারাবার ভিত্তিতে অর্থায়ন করে রফতানিকৃত সম্পদে পূর্ব সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক হারে অংশীদার হতে পারে। রফতানিকারকের কোনরূপ উদাসীনতার কারণে লোকসান হলে অর্থায়নকারী নিজেকে তা থেকে মুক্ত রাখার জন্য এ শর্তারোপ করতে পারে যে, এলসির শর্তানুযায়ী পণ্য পাঠানোর দায়িত্ব রফতানিকারকের উপর। যদি এলসির শর্তের সাথে কোন রকম ব্যবধান পাওয়া যায়, তাহলে এর দায়-দায়িত্ব শুধুমাত্র রফতানিকারকের উপর বর্তাবে। এধরনের শর্তারোপ থাকলে কোন লোকসান হলে তা থেকে অর্থায়নকারী মুক্ত থাকবে। কেননা, এ লোকসান রফতানিকারকের উদাসীনতার কারণে হয়েছে। কিন্তু অর্থায়নকারীকে রফতানিকারকের সাথে অংশীদার হওয়ার সুবাধে ঐসব লোকসান বহন করতে হবে, যা রফতানিকারকের কোনরূপ অসতর্কতা বা উদাসীনতা ছাড়া হয়েছে।[১]

---

১. আমদানি রফতানির অর্থায়ন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ইসলাম আওর জাদীদ মাঈসাত ওয়া তিজারাত দ্রষ্টব্য, ১৪৭-১৫২পৃষ্ঠা।

## ওয়ার্কিং ক্যাপিট্যালে অর্থায়ন ঃ

**(Financing of the working capital)**

যদি কোন চলতি ব্যবসার ওয়ার্কিং ক্যাপিট্যালের জন্য অর্থায়নের প্রয়োজন হয় তাহলে মুশারাকার মাধ্যম নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হতে পারে।

(১) পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে চলতি ব্যবসার সমুদয় সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করে নেয়া হবে। পূর্বে মুশারাকার প্রাচীন পদ্ধতির বর্ণনায় আলোচনা করা হয়েছে যে, ইমাম মালেক (রহ.)-এর মাযহাব অনুযায়ী মুশারাকার মূলধন তরল-নগদ আকৃতিতে বিনিয়োগ করা জরুরী নয়। দ্রব্যগত সম্পদও মূল্য নির্ধারণ করত মুশারাকার অংশ হতে পারে। এ দৃষ্টিভঙ্গিকে এখানে গ্রহণ করা যেতে পারে। এভাবে ব্যবসার সম্পদের মূল্যকে ব্যবসায়ীর মূলধন ধরা হবে, অপরদিকে অর্থায়নকারীর প্রদেয় অর্থকে মূলধনে তার অংশ মনে করা হবে। মুশারাকা একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা তথা এক বছর, ছয় মাস বা এর চেয়ে কম-বেশি সময়ের জন্যও হতে পারে। উভয়পক্ষ অর্থায়নকারীর প্রাপ্য মুনাফার আনুপাতিক হার নির্ধারণ করে নিবে। তবে অর্থায়নকারী ব্যবসায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ না করার কারণে মুনাফার হার তার মূলধনের চেয়ে অধিক না হতে হবে। মুশারাকার মেয়াদান্তে তরল এবং দ্রব্যগত সমুদয় সম্পদের পুনরায় মূল্য নির্ধারণ করে মুনাফা উক্ত মূল্যের ভিত্তিতে বণ্টন করে নেয়া হবে।

যদিও প্রাচীন পদ্ধতি অনুযায়ী মুনাফা ততক্ষণ পর্যন্ত নির্ধারণ করা যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসার সমুদয় সম্পদকে তরল আকৃতিতে রূপান্তরিত করা না হবে। কিন্তু সম্পদের মূল্য নির্ধারণকে পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে তরল আকৃতির মনে করা যেতে পারে। কেননা এরূপ করার ব্যাপারে শরীয়তে কোন নিষিদ্ধতা নেই। অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, সক্রিয় অংশিদার (Working Partner) ব্যবসার সম্পদে অর্থায়নকারীর অংশকে ক্রয় করে নিয়েছে, এবং তার অংশের মূল্য নির্ধারণ ব্যবসার সম্পদের মূল্য ধরে করা হয়েছে, এতে মুশারাকার শর্তানুযায়ী তার জন্য সাব্যস্তকৃত মুনাফার হারকেও সামনে রাখা হয়েছে।



উদাহরণস্বরূপ- 'A' এর ব্যবসার সমুদয় সম্পদ ৩০ ইউনিট। 'B' আরো ২০ ইউনিট অর্থায়ন করেছে। এতে করে ব্যবসার মোট সম্পদ হল ৫০ ইউনিট। শতকরা হিসেবে এই ব্যবসায় ৪০% 'B' -এর পক্ষ থেকে বিনিয়োগ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৬০% 'A' -এর ছিল। উভয়পক্ষ এ সিদ্ধান্ত করল যে, 'B' প্রকৃত মুনাফার ২০% পাবে। মেয়াদান্তে ব্যবসার মোট সম্পদ হলো ১০০ ইউনিট। এ পর্যায়ে 'A' যদি 'B' -এর অংশ ক্রয় করতে চায়, তাহলে 'B' ব্যবসার ৪০% মালিক হওয়ার কারণে 'A' 'B' কে ৩০ ইউনিটের মূল্য দিয়ে দিবে। তবে তার অংশের মূল্যে মুনাফার পূর্ব নির্ধারিত হারের বিপরীত হবে, মূল্য ধার্যের ফরমুলা ভিন্ন, ব্যবসার যে কোন মুনাফা উভয়পক্ষের মাঝে ২০% এবং ৮০% হারে বণ্টন হবে, যেহেতু মুনাফা বণ্টনের এই আনুপাতিক হার চুক্তিতে পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়েছিল।

ব্যবসার মূল্যে যেহেতু ৫০ ইউনিট লাভ হয়েছে। তাই এ ৫০ ইউনিট উভয়ের মাঝে ২০-৮০% হারে বণ্টন হবে। যার অর্থ এটা দাঁড়াবে যে, 'B' মুনাফার ১০ ইউনিট পেয়েছে, এ ১০ ইউনিটকে মূলধন ২০ ইউনিটের সাথে যোগ করা হলে তার অংশের মূল্য ৩০ ইউনিট দাঁড়াবে।

লোকসানের ক্ষেত্রে সম্পদের মূল্যে যে কোন ধরনের ঘাটতি তাদের বিনিয়োগকৃত পুঁজির অনুপাতেই বণ্টন হবে। অর্থাৎ, ৪০% এবং ৬০% হারে লোকসান বহন করতে হবে। সুতরাং উল্লেখিত উদাহরণে ব্যবসার মূল্যে যদি ১০ ইউনিট ঘাটতি হয়, যার কারণে ৪০ ইউনিট অবশিষ্ট থাকে, তাহলে ৪ ইউনিটের লোকসান 'B' বহন করবে, (যা সমুদয় লোকসানের ৪০%)। এই ৪ ইউনিটকে তার বিনিয়োগকৃত ২০ ইউনিট থেকে বিয়োগ করা হলে 'B' -এর অংশের মূল্য দাঁড়াবে ১৬ ইউনিট। এই ফরমুলাটি ২ নং চিত্রে আরো সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হবে।
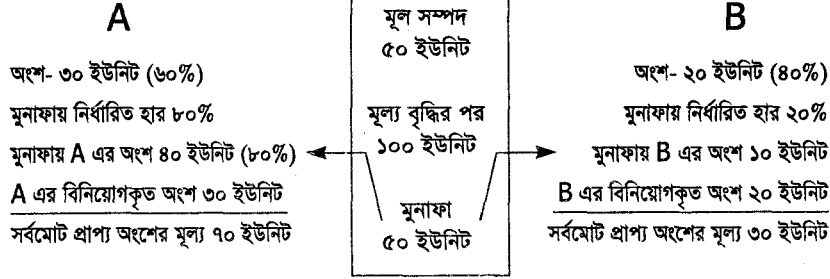
## ২। শুধু গ্রোস প্রফিটে (মোট লাভে) অংশীদারিত্ব ঃ

যে ব্যবসায় স্থাবর সম্পদ (Fixed Assets) বেশি, সে ব্যবসায় উল্লেখিত নিয়মানুযায়ী মুশারাকা পদ্ধতিতে অর্থায়ন করা জটিল হতে পারে, বিশেষ করে চলতি শিল্প কারখানায়। কেননা, অংশীদারিত্বের সময় সমুদয় সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করা এবং ব্যবসার মেয়াদান্তে সেগুলোর মূল্যে ঘাটতি ও বৃদ্ধি নির্ধারণ একাউন্টিং-এর দৃষ্টিতে জটিলতা এবং পরস্পরে দ্বন্দ-কলহের কারণ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে মুশারাকায় অন্য আরেকটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

এমতাবস্থায় পরোক্ষ খরচের হিসাব-নিকাশে বেশি জটিলতা দেখা দেয়। যেমন- মেশিনারী দ্রব্যের মূল্যে ঘাটতি, কর্মচারিদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি। এ জটিলতা সমাধানের জন্য উভয়পক্ষ এ সিদ্ধান্তে একমত হতে পারে যে, নীট লাভ (Net Profit) -এর পরিবর্তে মোট লাভ (Gross Profit)[১] বণ্টন হবে।

১. লাভ লোকসান তৈরি করার পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট পরিভাষাসমূহ বিস্তারিত জানার জন্য ইসলাম আওর জাদীদ মা'ঈসোত ও তিজারাত দ্রষ্টব্য ঃ পৃষ্ঠা নং ৬৮-৬৯।



যার অর্থ এটা হবে যে, যাবতীয় পরোক্ষ খরচ শিল্পপতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বহন করবে। শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ খরচ (যেমন- কাঁচা মাল, সরাসরি কর্মচারি বেতন, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি) মুশারাকা বহন করবে। তবে শিল্পপতি যেহেতু স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীয় মেশিনারী, বিল্ডিং এবং কর্মচারি স্টাফ মুশারাকায় পেশ করে, এজন্য তাকে উপযুক্ত প্রতিদান দেওয়ার ব্যাপারে মুনাফায় তার আনুপাতিক অংশ অধিক ধার্য করা যেতে পারে।

উক্ত পদ্ধতিটি এ কারণেও যুক্তিসঙ্গত যে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রাহক (অর্থাৎ- তাদের থেকে অর্থ গ্রহণকারী) সাধারণত নিজেকে ঐ উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে না, যে উদ্দেশ্যের জন্য সে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। বরং তার মেশিনারী এবং কর্মচারি স্টাফ অন্যান্য এমন কাজেও লিপ্ত থাকে, যেগুলোর মুশারাকার সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না। এ ক্ষেত্রে (মেশিনারী ইত্যাদির) এসব ব্যয় মুশারাকা থেকে প্রদান করা যায় না। একটি বাস্তব উদাহরণ যেমন- একটি তুলা ফ্যাক্টরীর একটি বিল্ডিং রয়েছে, যার মূল্য বাইশ মিলিয়ন টাকা, প্লান্ট এবং মেশিনারী দ্রব্যের মূল্য দুই মিলিয়ন এবং কর্মচারি স্টাফের মাসিক বেতন পঞ্চাশ হাজার পরিশোধ করা হয়। ফ্যাক্টরী একটি ব্যাংক থেকে এক বছরের মেয়াদে পঞ্চাশ লাখ (পাঁচ মিলিয়ন) টাকা মুশারাকার ভিত্তিতে ফিন্যান্সিং হিসেবে গ্রহণ করতে চায়, অর্থাৎ- এক বছর পর মুশারাকা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে এবং এক বছর পর্যন্ত অর্জিত মুনাফা উভয়পক্ষের মাঝে নির্ধারিত আনুপাতিক হারে বণ্টিত হবে। মুনাফা নির্ধারণের সময় যাবতীয় প্রত্যক্ষ খরচ (Direct Expenses) লাভ থেকে বাদ যাবে।

প্রত্যক্ষ খরচে নিম্নবর্ণিত ব্যয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হয় ঃ

১। কাঁচা মাল ক্রয়ে ব্যয়িত টাকা।

২। যেসব কর্মচারি কাঁচামাল উন্নয়নে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত তাদের বেতন।

৩। তুলার কাজে ব্যয়িত বিদ্যুৎ বিল।

৪। অন্যান্য সেবাসমূহের বিল যা প্রত্যক্ষভাবে মুশারাকাকে সরবরাহ করা হয়েছে।

এই বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, বিল্ডিং, মেশিনারী এবং কর্মচারিদের বেতন-ভাতা শুধুমাত্র মুশারাকা ব্যবসার জন্য নয়। কেননা, মুশারাকাতো এক বছর পর শেষ হয়ে যাবে, অথচ বিল্ডিং-মেশিনারী দীর্ঘ সময়ের জন্য ক্রয় করা হয়েছে। যে সময়ের মধ্যে তুলা ফ্যাক্টরী বিল্ডিংকে স্বীয় কারবারের জন্য ব্যবহার করতে থাকবে। যার এক বছর মুশারাকার সাথে কোন সম্পর্ক হবে না। এ কারণে বিল্ডিং এবং মেশিনারীর মূল্যের যাবতীয় ব্যয়ভার ঐ স্বল্প সময়ের মুশারাকার উপর দেয়া যায় না। বেশির চেয়ে বেশি এতটুকু করা যেতে পারে যে, মুশারাকা চলাকালীন সময়ে বিল্ডিং এবং মেশিনারীর ক্ষয়িতকে মুশারাকার খরচে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই ক্ষয়িতের মূল্য নির্ধারণ অত্যন্ত কঠিন হবে এবং এ কারণে কলহ-কোন্দলও সৃষ্টি হতে পারে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য দু'টি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

প্রথমত, উভয়পক্ষ এই সিদ্ধান্ত করবে যে, "মুশারাকা" গ্রাহককে (অর্থ গ্রহণকারী আসল মালিককে) মেশিনারী এবং বিল্ডিং ব্যবহার করার কারণে নির্ধারিত ভাড়া প্রদান করবে। মুশারাকার পক্ষ থেকে সে এই ভাড়া সর্বাবস্থায় পাবে, চাই ব্যবসায় লাভ হোক কিংবা লোকসান হোক। দ্বিতীয়ত, গ্রাহককে ভাড়া প্রদানের পরিবর্তে মুনাফায় তার আনুপাতিক হার বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে 'সেবায় মুদারাবার উপর' কিয়াস করে সঠিক সাব্যস্ত করা যেতে পারে, যা ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ.)-এর নিকট বৈধ।

## (৩) দৈনিক উৎপাদনের ভিত্তিতে চলতি যৌথ একাউন্ট

অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোন কোন ব্যবসার ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের অর্থায়ন এ পদ্ধতিতে করে যে, (আর্থিক প্রতিষ্ঠানে) উক্ত ব্যবসার জন্য



একটি চলতি একাউন্ট খোলা হয়। যে একাউন্ট থেকে সে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ উত্তোলন করে। এমনিভাবে প্রয়োজনাতিরিক্ত টাকা সে একাউন্টে পুনরায় জমাও দেয়। এভাবে উত্তোলন এবং জমা (Debit and Credit) এর কার্যক্রম মেয়াদ উত্তীর্ণ (Maturity) -এর তারিখ পর্যন্ত চলতে থাকে এবং সুদের হিসাব দৈনিক উৎপাদনের ভিত্তিতে (On the basis of daily products) করা হয়।

এ ধরনের পদ্ধতি মুশারাকা এবং মুদারাবার অর্থায়নে সম্ভব কি না। এ কথা সুস্পষ্ট যে, এটি একটি নতুন পদ্ধতি হওয়ার কারণে এ প্রশ্নের উত্তর সুস্পষ্টভাবে প্রাচীন ইসলামী গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায় না। এতদসত্ত্বেও মুশারাকার মৌলিক ধারণাকে সামনে রেখে এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিম্নবর্ণিত পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

(১) সার্ভিসের জন্য প্রকৃত মুনাফার একটি বিশেষ আনুপাতিক হার নির্ধারণ করতে হবে।

(২) মুনাফার অবশিষ্ট আনুপাতিক অংশ শুধুমাত্র পুঁজি বিনিয়োগকারীর জন্য হতে হবে।

(৩) যদি কোন লোকসান হয়, তাহলে তা শুধুমাত্র পুঁজি বিনিয়োগকারীগণ তাদের পুঁজির অনুপাতে বহন করতে হবে।

(৪) যৌথ একাউন্টে অন্তর্ভুক্তকৃত টাকার স্থিতি গড় (যার হিসাব দৈনিক উৎপাদনের ভিত্তিতে করা হবে) অর্থায়নের শেয়ার ক্যাপিটাল ধরা হবে।

(৫) মেয়াদ শেষে অর্জিত মুনাফার হিসাব দৈনিক উৎপাদনের ভিত্তিতে করা হবে এবং সে অনুযায়ীই তা বণ্টন করা হবে। যদি এ ধরনের চুক্তি উভয়ের মাঝে সাব্যস্ত হয়ে যায়, তাহলে তা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুশারাকার কোন বুনিয়াদি মূলনীতির পরিপন্থি বলে মনে হয় না। এতদসত্ত্বেও এই প্রক্রিয়ার ব্যাপারে অভিজ্ঞ ইসলামী ফিক্‌হবিদদের আরো অধিক গবেষণা এবং অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে। বাহ্যিক কার্যক্রমে এ কথা বুঝা যায় যে, উভয়পক্ষ এ নীতিমালায় একমত হয়েছে যে, মেয়াদান্তে যৌথ একাউন্টে অর্জিত মুনাফা দৈনিক ব্যবহৃত পুঁজির ভিত্তিতে বণ্টিত হবে। যার

অর্থ এটা দাঁড়াবে যে, দৈনিক এক টাকায় অর্জিত মুনাফার গড় বের করে প্রতি দিনের প্রতি টাকার মুনাফার গড়কে তত দিনের সংখ্যার সাথে গুণ দেয়া হবে যত দিন প্রত্যেক পুঁজি বিনিয়োগকারী স্বীয় অর্থ ব্যবসায় রেখেছে। যার ফলে বিনিয়োগকারীর মুনাফায় পাওনাদার হওয়ার ফায়সালা দৈনিক উৎপাদনের ভিত্তিতে করা হবে।

সমকালীন কোন কোন আলিমগণ এ পদ্ধতিতে মুনাফা হিসাব করার অনুমতি প্রদান করেন না। এ ভিত্তিতে যে, এটা একটি আনুমানিক পদ্ধতি- যা কোন অংশীদারের অর্জিত প্রকৃত মুনাফার প্রতিবিম্ব বর্ণনা (عكاسى) করে না। কেননা, এমন হতে পারে যে, কোন এক সময় ব্যবসায় প্রচুর মুনাফা অর্জিত হয়েছে, যখন বিশেষ কোন পুঁজি বিনিয়োগকারীর কোন পুঁজি এ সময়ে ব্যবসায় বিনিয়োগ-ই হয়নি বা হলেও তা ন্যূনতম ও অনুল্লেখযোগ্য পরিমাণ ছিল। অথচ তার সাথে অন্যান্য ঐ সকল পুঁজি বিনিয়োগকারীদের ন্যায় লেনদেন করা হবে, যারা এ সময়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছিল। পক্ষান্তরে কোন সময় ব্যবসায় প্রচুর লোকসান হতে পারে, যখন একজন বিশেষ পুঁজি বিনিয়োগকারী বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছিল, অথচ সে তার লোকসানের একটি অংশ অন্যান্য ঐ সকল পুঁজি বিনিয়োগকারীদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যারা উক্ত সময়ে ব্যবসায় কোন অর্থ বিনিয়োগ করেনি বা করলেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ছিল না।

এ যুক্তির এই উত্তর দেয়া যেতে পারে যে, মুশারাকায় কোন অংশীদারের জন্য শুধুমাত্র তার বিনিয়োগকৃত অর্থ দ্বারা অর্জিত মুনাফাই পেতে হবে তা জরুরী নয়। বরং মুশারাকা অস্তিত্বে আসার পর যৌথ একাউন্টে অর্জিত মুনাফা সকল অংশীদারগণ পাবে। এদিকে লক্ষ্য করা হবে না যে, তাদের অর্থ বিশেষ ব্যবসায় বিনিয়োগ হয়েছে কি না। এ যুক্তিটি বিশেষভাবে ফিক্‌হে হানাফীর উপর প্রযোজ্য হয়। ফিক্‌হে হানাফী অনুযায়ী মুশারাকা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য অংশীদারদের অর্থের আকৃতিতে বিনিয়োগকৃত পুঁজি পরস্পরে মিশ্রণ করে নেওয়া জরুরী নয়। তার অর্থ এটা দাঁড়াল যে, 'ক' যদি 'খ' এর সাথে একটি মুশারাকা চুক্তিতে অন্ত



র্ভুক্ত হয়, কিন্তু 'ক' এখনো যৌথ একাউন্টে তার অর্থ জমা করেনি, তারপরও 'খ' এর অর্থ দ্বারা মুশারাকায় যে মুনাফা অর্জন হবে, তাতে 'ক'ও তার অংশের পাওনাদার হবে।[১] যদিও মুনাফায় তার অংশ পাওয়ার অধিকার লাভ হওয়াটা ঐ অর্থ পরিশোধের সাথে সর্ম্পকৃত, যতটুকুর দায়িত্ব সে নিয়েছিল। তদুপরি এই বাস্তবতা বিদ্যমান যে, এই বিশেষ চুক্তির মুনাফা তার অর্থ থেকে অর্জিত হয়নি। কেননা, পরবর্তীতে 'ক' যখন তার অর্থ পরিশোধ করবে তাতো অন্য কোন লেনদেনে ব্যবহৃত হবে। যেমন- 'ক' এবং 'খ' এক লাখ টাকা দিয়ে ব্যবসা করার জন্য একটি মুশারাকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তারা উভয়ে এ সিদ্ধান্ত করল যে, প্রত্যেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করবে এবং মুনাফা সমহারে বণ্টিত হবে। 'ক' এখনও তার পঞ্চাশ হাজার টাকা যৌথ একাউন্টে জমা করেনি, ইতিমধ্যে 'খ' একটি লাভজনক ব্যবসা দেখে নিজের পক্ষ থেকে বিনিয়োগকৃত পঞ্চাশ হাজার টাকা দ্বারা মুশারাকার জন্য দু'টি এয়ার কন্ডিশনার ক্রয় করে ষাট হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়েছে। যাতে দশ হাজার টাকা মুনাফা অর্জন হয়েছে। 'ক' তার অংশ পঞ্চাশ হাজার টাকা এই ব্যবসার পর যৌথ একাউন্টে জমা করেছে, তার পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে দু'টি রিফ্রিজারেটর ক্রয় করে আটচল্লিশ হাজার টাকার ঊর্ধ্বে বিক্রি করা যাচ্ছে না, অর্থাৎ- এতে দু'হাজার টাকা লোকসান হয়েছে। যদিও 'ক'-এর অর্থ দ্বারা কৃত ব্যবসায় দু'হাজার টাকা লোকসান হয়েছে, অথচ এয়ার কন্ডিশনারে মুনাফায় শুধুমাত্র 'খ'-এর টাকা ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে 'ক'-এর কোন অংশ ছিল না, তদুপরি 'ক' প্রথম (এয়ার কন্ডিশনারে) ব্যবসার মুনাফায় তার অংশের পাওনাদার হবে। দ্বিতীয় (রিফ্রিজারেটর) ব্যবসায় যে দু'হাজার টাকা লোকসান হয়েছে, তা প্রথম ব্যবসার মুনাফা থেকে বিয়োগ করা হবে। ফলে মোট মুনাফা হবে আট হাজার টাকা। এই আট হাজার টাকা উভয়ের মাঝে সমহারে বণ্টিত হবে। অর্থাৎ 'ক' চার হাজার টাকা পাবে, যদিও তার অর্থ দ্বারা কৃত ব্যবসায় লোকসান হয়েছিল।

---

১. বাদায়িউস সানাই, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা নং- ৫৪, ৬০।

কারণ, যখন উভয়পক্ষ মুশারাকা চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তখন মুশারাকার জন্য যে কোন চুক্তি হবে তা এই যৌথ একাউন্টের সাথে সম্বন্ধ-যুক্ত হবে। এদিকে দৃষ্টিপাত করা হবে না যে, এই ব্যবসায় কার অর্থ এককভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। এই মুশারাকা চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে প্রত্যেকেই প্রত্যেক ব্যবসায় অংশীদার হবে।

উপরোল্লেখিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর একটি সম্ভাব্য প্রশ্ন হতে পারে যে, উল্লেখিত উদাহরণে 'ক' পঞ্চাশ হাজার টাকা দেয়ার দায়িত্ব নিয়েছিল, আর ব্যবসা শুরু করার পূর্বেই জানা ছিল যে, সে এত টাকা মুশারাকায় বিনিয়োগ করবে। কিন্তু প্রচলিত মুশারাকার চলতি একাউন্ট যেখানে নতুন অংশীদার প্রতিদিন অন্তর্ভূক্ত হয় পুরাতন কেউ কেউ চলে যায়। এতে কোন অংশীদার নির্দিষ্ট পরিমাণ কোন অর্থ বিনিয়োগ করার দায়িত্ব নিজের উপর নেয় না। সুতরাং মুশারাকায় অন্তর্ভুক্তির সময় প্রত্যেক পক্ষ থেকে বিনিয়োগকৃত পুঁজি অনির্দিষ্ট থাকে। যার ফলে মুশারাকা সঠিক না হওয়া উচিত।

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, মুশারাকা সঠিক হওয়ার জন্য সমুদয় মূলধনের পরিমাণ সম্পর্কে অংশীদারদের পূর্ব থেকেই জানা থাকা জরুরী কি না, এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী ফিক্‌হবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন ধরনের। হানাফী ফিক্‌হবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, মুশারাকা সঠিক হওয়ার জন্য তা শর্ত নয়। প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ আল্লামা কাসানী লিখেন-

وأما العلم بقدر رأس المال وقت العقد فليس بشرط لجواز الشركة بالأموال عندنا، وعند الشافعي شرط .... ولنا أن الجهالة لا تمنع جواز العقد لعينها، بل لإفضائها إلى المنازعة، وجهالة رأس المال وقت العقد لا تفضي إلى المنازعة، لأنه يعلم مقداره ظاهرا وغالبا، لأن الدراهم والدنانير توزنان وقت الشراء فيعلم مقدارها، فلايؤدي إلى جهالة مقدار الربح وقت القسمة.



'আমাদের (হানাফীদের) নিকট শিরকাতুল আমওয়াল বৈধ হওয়ার জন্য এটা জরুরী নয় যে, চুক্তির সময় মূলধনের পরিমাণ জানা থাকতে হবে। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর নিকট তা শর্ত,-। আমাদের প্রমাণ হল- অজ্ঞতা সত্তাগতভাবে চুক্তির বৈধতার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। বরং এ কারণে প্রতিবন্ধক যে, এর দ্বারা ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার কারণ হতে পারে। আর চুক্তির সময় মূলধন জানা না থাকা ঝগড়ার কারণ হয় না। কেননা, মূলধনের পরিমাণ সাধারণত মুশারাকার জন্য কোন দ্রব্য ক্রয় করার সময় পরিজ্ঞাত হয়ে যায়। সুতরাং বণ্টনের সময় মুনাফার পরিমাণে অজ্ঞতা সৃষ্টি হবে না।'[১]

এ কথা সত্য যে, চলতি যৌথ একাউন্টের পদ্ধতি, যে একাউন্টে অংশীদারগণ যে কোন সময় যে কোন পরিমাণ টাকা উত্তোলন করতে পারে এবং যে কোন পরিমাণ টাকা জমা করতে পারে আর মুনাফা দৈনিক উৎপাদনের ভিত্তিতে বণ্টন হয়, এ পদ্ধতি ইসলামী ফিক্‌হের প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায় না। তবে এ না পাওয়া যাওয়া কোন পদ্ধতিকে শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ সাব্যস্ত করে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা মুশারাকার বুনিয়াদী মূলনীতির পরিপন্থি না হবে। প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে সকল অংশীদারদের সাথে একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। প্রত্যেক অংশীদারদের মুনাফার হিসাব ঐ মেয়াদের ভিত্তিতে করা হয়, যতদিন তার অর্থ যৌথ একাউন্টে ছিল। নিঃসন্দেহে যৌথ একাউন্টে সামগ্রিকভাবে অর্জিত মুনাফা ঐ অর্থ যৌথভাবে ব্যবহার করার কারণে অর্জিত হয়েছে, যা অংশীদারগণ বিভিন্ন সময় জমা করেছিল। যদি সকল অংশীদার পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নেয় যে, মুনাফা দৈনিক উৎপাদনের ভিত্তিতে বণ্টন হবে, তাহলে এমন কোন শরয়ী নিষেধাজ্ঞা নেই যা তাকে অবৈধ সাব্যস্ত করবে। বরং উল্টা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ মৌলিক হেদায়াতের সমর্থনই পাওয়া যায় যা পূর্বে কয়েকবার উল্লেখিত প্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে-

"المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما"

---

১. (বাদায়িউস সানাই, ৬/৬৩)।

"মুসলমানদের পারস্পরিক চুক্তিসমূহ পালনীয়, যতক্ষণ পর্যন্ত এ চুক্তি হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল না করবে।"

(আবূ দাউদ, হাদীস নং-৩৫৫৫)।

যদি দৈনিক উৎপাদনের ভিত্তিতে মুনাফা বন্টন পদ্ধতিকে গ্রহণ না করা হয়, তাহলে এর অর্থ হবে, কোন অংশীদার যৌথ একাউন্ট থেকে অর্থ উত্তোলনও করতে পারবে না এবং নতুন কোন গ্রাহক অর্থ জমাও করতে পারবে না। এমনিভাবে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত নতুন করে কোন পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন কোন নির্দিষ্ট তারিখ না আসবে। ব্যাংকের যে আমানতকারীগনের পক্ষ থেকে (Deposits Side) দৈনিক কয়েকবার অর্থ জমা দেয়া এবং উত্তোলন করা হয়, তাদের জন্য এ প্রক্রিয়া একেবারে অকার্যকর হয়ে যাবে। দৈনিক উৎপাদনের পদ্ধতিকে অস্বীকার করার দ্বারা এসব আমনতকারীগণ তাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ কোন লাভজনক একাউন্টে জমা করার পূর্বে কয়েক মাস অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়ে যাবে। এর দ্বারা শিল্প এবং ব্যবসার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে এবং দীর্ঘ মেয়াদের জন্য অর্থায়ন বিভাগের কার্যক্রম নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে। এ সমস্যার সমাধান দৈনিক উৎপাদনের পদ্ধতি অবলম্বন করা ব্যতীত সম্ভব নয়। যেহেতু এটা শরীয়তের কোন বিধানের পরিপন্থি নয়, সেহেতু এ পদ্ধতি অবলম্বন না করার কোন যৌক্তিকতা নেই।

## যৌথ অর্থায়নের উপর কয়েকটি অভিযোগ

এ পর্যায়ে আমরা ঐ সকল অভিযোগের নিরীক্ষা করব যা মুশারাকাকে অর্থায়নের পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে বাস্তব দৃষ্টিতে উত্থাপন করা হয়।

### (১) লোকসানের ঝুঁকি

একটি অভিযোগ এই যে, মুশারাকা পদ্ধতি অবলম্বন করার ক্ষেত্রে ব্যবসার লোকসান অর্থায়নকারী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দিকে ধাবিত



হওয়ার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে। অতঃপর এই লোকসান সাধারণ আমানতকারীগণদের দিকেও ধাবিত হবে। আমানতকারীগণকে যেহেতু স্থায়ীভাবে লোকসানের আশংকায় ফেলা হচ্ছে, সেহেতু তারা ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে তাদের অর্থ জমা রাখতে অনুৎসাহী হয়ে যাবে। যার ফলে এ প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ হয়ত নিষ্ক্রিয় ও শ্লথ হয়ে যাবে, অথবা ব্যাংকিং পদ্ধতি ভিন্ন অন্য কোন পন্থায় ব্যবহৃত হবে। এভাবে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ অর্থসমূহের কোন ভূমিকাই থাকবে না। কিন্তু এ অভিযোগের ভিত্তি ভুল বুঝাবুঝির উপর। মুশারাকার ভিত্তিতে অর্থায়ন করার পূর্বে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঐ প্রস্তাবিত ব্যবসার সম্ভাব্যতা (Feasibility) যাচাই করে নিবে, যার জন্য ফান্ড প্রয়োজন। এমনকি বর্তমান সুদি ব্যাংকিং পদ্ধতিতেও ব্যাংক প্রত্যেক আবেদনকারীর ঋণ মঞ্জুর করে না। বরং তারা ব্যবসার সম্ভাব্যতা যাচাই করে নেয়। যদি তাদের আশংকা হয় যে, এই ব্যবসা লাভজনক নয়, তাহলে তারা ঋণ প্রদান করতে অস্বীকার করে। মুশারাকার ক্ষেত্রে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই সম্ভাব্যতা অত্যন্ত গভীরভাবে এবং সতর্কতার সাথে যাচাই করে নিবে।

অধিকন্তু কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজেকে শুধুমাত্র একটি মুশারাকায় সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না। বরং তাদের বিভিন্ন রকমের মুশারাকা থাকবে। যদি কোন ব্যাংক তার গ্রাহকদের (Clients) থেকে একশ' গ্রাহকের সাথে মুশারাকার ভিত্তিতে অর্থায়ন করে এবং এ অর্থায়নও ব্যাংক তাদের প্রত্যেকের প্রস্তাবিত ব্যবসার সম্ভাব্যতা যাচাই করে করে তাহলে এ ধারণা করা অত্যন্ত দুষ্কর যে, তাদের প্রত্যেকেই বা অধিকাংশ গ্রাহক লোকসানে পতিত হবে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনের পর বেশির চেয়ে বেশি এতটুকু হতে পারে যে, তাদের কারো কারো ব্যবসায় লোকসান হয়ে যাবে। কিন্তু অপরদিকে লাভজনক মুশারাকা ব্যবসায় সুদি ঋণের তুলনায় অধিক মুনাফার আশা করা যায়। কেননা প্রকৃত মুনাফা ব্যাংক এবং গ্রাহকের (Client) মাঝে বণ্টন হবে। এ কারণে মুশারাকার সকল সেক্টরে লোকসানের আশংকা করা যায় না। আর সামগ্রিকভাবে লোকসানের সম্ভাবনা শুধুমাত্র কাল্পনিক বিষয়, যা আমানতকারীগণকে অনুৎসাহী করবে না। কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এ

ধরনের কাল্পনিক সম্ভাব্যতা কোন জয়েন্ট স্টক কোম্পানীতে লোকসানের সম্ভাব্যতা থেকে অনেক কম, যার ব্যবসা একটি সীমিত সেক্টরে সীমাবদ্ধ থাকে। এতদসত্ত্বেও মানুষ তার শেয়ার ক্রয় করে এবং লোকসানের এ সম্ভাব্যতা তাদেরকে ঐ শেয়ারে পুঁজি বিনিয়োগ করা থেকে বিরত রাখে না। ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা ব্যবস্থাপনা জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর তুলনায় যথেষ্ট সুদৃঢ় ও সুসংগঠিত। কেননা তাদের মুশারাকা ব্যবসা বিভিন্ন প্রকার হবে যে, প্রত্যেক মুশারাকায় সম্ভাব্য লোকসানের ক্ষতিপূরণ অন্যান্য মুশারাকা ব্যবসায় অর্জিত মুনাফা দ্বারা হয়ে যাবে।

এ ছাড়া ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্রে এমন মন-মানসিকতা সৃষ্টি করা উচিত যার দ্বারা এ বিশ্বাস করা যায় যে, বিনিয়োগকৃত অর্থ দ্বারা অর্জিত যে কোন মুনাফা ব্যবসার ঝুঁকি গ্রহণ করার প্রতিদান। অভিজ্ঞতা এবং ব্যবসার সকল সেক্টরের পরিধি বিস্তৃত করে এ ঝুঁকি এত কমানো যায় যে, তা একেবারে কাল্পনিক হিসেবে থেকে যাবে। তবে এ ঝুঁকি একেবারে দূর করার কোন পন্থা বা উপায় নেই। যে কেউ মুনাফা অর্জন করতে চায়, তাকে এ ধরনের সাধারণ ঝুঁকি অবশ্যই বহন করতে হবে। সাধারণ জয়েন্ট স্টক কোম্পানীতেও এ ধরনের ঝুঁকি রয়েছে, অথচ কখনো কেউ এ ধরনের অভিযোগ করেনি যে, শেয়ার হোল্ডারের অর্থ লোকসানে ফেলে দিয়েছে। এ সমস্যা প্রচলিত ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতির সৃষ্টি, যা ব্যাংকিং এবং অর্থায়নের কর্মতৎপরতাকে সাধারণ ব্যবসায়িক কর্মতৎপরতা থেকে আলাদা করে দিয়েছে। প্রচলিত পদ্ধতি মানুষদেরকে এ কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছে যে, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র মুদ্রা এবং মুদ্রার দলীল দস্তাবেজের ব্যবসা করতে পারে, তাদের শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। যার কারণে তারা সর্বাবস্থায় নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা পাওয়ার দাবী করে। অর্থায়ন খাত (SECTOR) এবং শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতের মাঝে এই ভিন্নতা সামষ্টিক অর্থনীতিতে (MACRO ECONOMICS) মারাত্মক ক্ষতি সাধন করেছে। একথা সুস্পষ্ট যে, ইসলামী ব্যাংকিং-এর আলোচনা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই এটা নয় যে, ইসলামী ব্যাংক প্রত্যেক ক্ষেত্রে আধুনিক ব্যাংকের অনুসরণ করবে। ইসলামের নিজস্ব রূপ ও নীতিমালা রয়েছে যা অর্থায়নকে



শিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে ভিন্ন মনে করে না। যখন এই ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনা বুঝে আসবে, তখন লোকসানের কাল্পনিক আশংকা থাকা সত্ত্বেও মানুষ লাভজনক কোম্পানীতে যে আগ্রহ ও উৎসাহের সাথে পুঁজি বিনিয়োগ করে, এর চেয়ে অধিক উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে ইসলামী অর্থায়ন সেক্টরে (Financing Sector) পুঁজি বিনিয়োগ করবে।

### (২) দীনদারী না থাকা

মুশারাকা অর্থায়নের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ এই উত্থাপন করা হয় যে, বদদীন গ্রাহক মুশারাকার এই পদ্ধতিকে অবৈধভাবে ব্যবহার করবে এবং অর্থায়নকারীকে কোন মুনাফা প্রদান করবে না। সে সর্বদা এটাই দেখাবে যে, ব্যবসায় কোন মুনাফা অর্জিত হয়নি। বরং হাক্বীকৃত হল সে এই দাবীও করতে পারে যে, ব্যবসায় লোকসান হয়েছে। যার ফলে লাভতো দূরের কথা আসল পুঁজি ফিরে পাওয়াও আশংকাজনক হয়ে পড়বে। নিঃসন্দেহে এটি একটি যথার্থ আশংকা। বিশেষ করে যে সমাজে চুরি ডাকাতি নিত্য-নৈমিত্তিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তবে এ সমস্যার সমাধান এত জটিলও নয় যা সাধারণত প্রচার করা হয় কিংবা বাড়িয়ে বর্ণনা করা হয়।

যদি কোন দেশের সকল তফসিলী ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক রাষ্ট্রের পূর্ণ সহায়তায় ইসলামী পদ্ধতি অনুযায়ী চালানো যায়, তাহলে বদদীনীর সমস্যার সমাধান জটিল হবে না। সর্বপ্রথম কথা এই যে, গ্রাহকদের হিসাব-নিকাশ রাখার জন্য উত্তম পদ্ধতিতে ডিজাইনকৃত অডিট সিস্টেম চালু করতে হবে এবং তা যথাযথভাবে কনট্রোল করতে হবে। এব্যাপারে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, মুনাফার নির্ধারণ শুধুমাত্র গ্রোস প্রফিটের ভিত্তিতে করা হবে। এর দ্বারা দ্বন্দ্ব-কলহ এবং ঘুষের প্রবণতা হ্রাস পাবে। এরপরও গ্রাহকের পক্ষ থেকে যদি কোনরূপ বদদীনী, অনিয়ম বা উদাসীনতা পাওয়া যায়, তাহলে তাকে সতর্কতামূলক শাস্তির সম্মুখীন করা হবে এবং তাকে দেশের যে কোন ব্যাংক থেকে যে কোন ধরণের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করার ব্যাপারে কমপক্ষে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বঞ্চিতও করা যেতে পারে। এই পদক্ষেপ প্রকৃত মুনাফা গোপন বা অন্য যে

কোন বদদীনী পন্থা অবলম্বনের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য প্রতিবন্ধক হিসেবে প্রমানিত হবে। অধিকন্তু ব্যাংকের গ্রাহকগণ স্বাধীনভাবে লোকসান দেখানোরও সাহস পাবে না। কেননা, লোকসান দেখানোর বিভিন্নভাবে তাদের স্বার্থের পরিপন্থি হবে। একথা সত্য যে, উপরোল্লিখিত কৌশল অবলম্বন করা সত্ত্বেও এমন পরিস্থিতির সম্ভাবনা রয়েছে, যে পরিস্থিতিতে কোন কোন গ্রাহক তার অসৎ উদ্দেশ্যে সফল হয়ে যেতে পারে। তবে শাস্তির পদক্ষেপ এবং ব্যবসার সাধারণ পরিবেশ এ ধরণের সুযোগ হ্রাস করে দিবে। (স্বয়ং সুদি অর্থনীতিতেও ঋণ খেলাফী ব্যক্তি ঋনকে উসূলের অযোগ্য করে (Bad Debts) জটিলতা সৃষ্টি করতে থাকে) কোন কোন গ্রাহকের অসৎ উদ্দেশ্য সফল হওয়া মুশারাকার পূর্ণ সিষ্টেমকে অস্বীকার করার যুক্তি সঙ্গত কারণ বা ওজর হতে পারে না।

নিঃসন্দেহে বদদীনীর এই আশংকা ঐ সব ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অনেক বেশি রয়েছে যারা আধুনিক ব্যাংকের সাধারণ কার্যক্রম থেকে পৃথক হয়ে কাজ পরিচালনা করে। তাদের প্রতি দেশীয় প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তেমন কোন সহযোগিতা থাকে না। ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান তারা তাদের সিস্টেমও পরিবর্তন করতে পারে না এবং বিধি-বিধানও অমান্য করতে পারে না। কিন্তু তাদের একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, তারা শুধুমাত্র ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান-ই নয়, বরং তারা এমন একটি সিস্টেমকে পরিচিত করানোর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার নিজস্ব একটি দর্শন রয়েছে। তাদের দায়িত্ব হল, এই পদ্ধতিকে অগ্রসর করানো যদিও এর কারণে কোন এক পর্যায়ে তাদের মুনাফার হার স্বল্প হওয়ার আশংকা থাকে। এ জন্য তাদের কমপক্ষে কয়েকটি নির্বাচিত নীতিমালার উপর ভিত্তি করে মুশারাকার ব্যবহার শুরু করা উচিত। প্রত্যেক ব্যাংকের অবশ্যই এমন কিছু গ্রাহক থাকে যাদের ঈমানদারী সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে থাকে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের কমপক্ষে ঐ সকল গ্রাহকদের সাথে অর্থায়ন সহীহ মুশারাকার ভিত্তিতে করা উচিত। এর দ্বারা সমাজে উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপনে সহায়ক হবে এবং অন্যরা তাদের অনুসরণের ব্যাপারে উৎসাহী হবে। অধিকন্তু এমন কিছু সেক্টরও রয়েছে, যেখানে মুশারাকার ভিত্তিতে অর্থায়ন অতীব সহজতার সাথে হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এক্সপোর্ট ফিন্যান্সিং (রপ্তানির অর্থায়ন)-এ মুশারাকাকে



ব্যবহার করা হলে বদদীনীর তেমন কোন সুযোগ থাকে না। কেননা, রপ্তানিকারকের নিকট বিদেশের গ্রাহকের একটি নির্দিষ্ট অর্ডার বিদ্যমান থাকে। মূল্য নির্ধারিত থাকে। ব্যয়ের আন্দাজ করাতেও কোন জটিলতা নেই। মূল্য পরিশোধে সাধারণত এলসির কারণে অনিয়ম হয় না। মূল্য পরিশোধ স্বয়ং ব্যাংকের মাধ্যমেই হয়। এমতাবস্থায় মুশারাকা পদ্ধতি অবলম্বন করাতে কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে কিছু সতর্কতার সাথে ইমপোর্ট ফিন্যান্সিং (আমদানীর অর্থায়ন)ও মুশারাকার ভিত্তিতে হতে পারে। যা এ অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে বর্ণনা করা হয়েছে।

### (৩) ব্যবসার গোপনীয়তা

মুশারাকার উপর আরেকটি অভিযোগ এটা করা হয় যে, অর্থায়নকারী (Financier) কে গ্রাহকের ব্যবসায় অংশীদার বানানোর দ্বারা ব্যবসার গোপনীয়তা তার (অর্থায়নকারীর) নিকট এবং তার মাধ্যমে অন্যান্য ব্যবসায়ীদের নিকট ফাঁস হয়ে যাবে।

কিন্তু এর সমাধান অত্যন্ত সহজ। মুশারাকায় অন্তর্ভুক্তির সময় গ্রাহক (Client) এ শর্তারোপ করতে পারে যে, অর্থসংস্থানকারী (Financier) ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না এবং সে ব্যবসার কোন ধরনের তথ্য কোন ব্যক্তিকে গ্রাহকের অনুমতি ব্যতীত পরিবেশন করবে না। গোপনীয়তা ঠিক রাখার এ ধরনের চুক্তিকে মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান সম্মান করে। বিশেষত ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান যাদের সমুদয় ব্যবসা-ই গোপনীয়তার ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

### (৪) গ্রাহকের মুনাফায় অংশীদারিত্বের ব্যাপারে উৎসাহী না হওয়া

কখনো কখনো এ কথা বলা হয় যে, গ্রাহক ব্যাংকসমূহের সাথে প্রকৃত মুনাফায় অংশীদার হতে চায় না, এই নিরুৎসাহিতার ভিত্তি দু'টি জিনিসের উপর।

(১) গ্রাহক মনে করে প্রকৃত মুনাফা, যা প্রচুর পরিমাণেও হতে পারে, তাতে ব্যাংক অংশীদারিত্বের কোন অধিকার রাখে না। কেননা, ব্যবসার ব্যবস্থাপনা এবং তা পরিচালনায় ব্যাংকের কোন ভূমিকা থাকে না। তাহলে

গ্রাহক তার পরিশ্রমের উপার্জিত মুনাফায় ব্যাংকসমূহকে কেন অংশীদার করবে যারা শুধুমাত্র ফান্ড সরবরাহ করে। গ্রাহক এই যুক্তিও প্রদান করে যে, আধুনিক ব্যাংক কিঞ্চিৎ সুদের হারে ঋণ প্রদান করতে রাজি হয়ে যায়, ইসলামী ব্যাংকসমূহেরও এরূপ করা উচিত।

(২) এ ছাড়া গ্রাহক এ ব্যাপারেও ভীতিপ্রদ থাকে যে, তার প্রকৃত মুনাফার পরিমাণ সম্পর্কে ব্যাংকের অবগতি হয়ে যাবে এবং তাদের মাধ্যমে এ তথ্য ইনকাম ট্যাক্সের কর্মকর্তাদের নিকট পৌছে যাবে, যার ফলে গ্রাহকের ইনকাম ট্যাক্সের হার বেড়ে যাবে।

প্রথম সমস্যার সমাধান যদিও সহজ নয়, তবে খুব জটিল এবং অসম্ভবও নয়। এ ধরনের গ্রাহকদেরকে এ কথা বুঝানোর চেষ্টা করা উচিত যে, কোনরূপ বাধ্য-বাধকতা ব্যতীত সুদি ঋণ গ্রহণ করা অত্যন্ত গুনাহ ও পাপের কাজ। শুধুমাত্র ব্যবসাকে বৃহদায়তন ও প্রশস্ত করা কোন ক্রমেই মারাত্মক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত নয়। মুশারাকার মাধ্যমে স্বীয় ব্যবসার জন্য বৈধ ফান্ডের সরবরাহের ব্যবস্থা করে সে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিই অর্জন করবে না বরং নিজের জন্য এবং ইসলামী ব্যাংক-এর জন্য মুনাফাকেও হালাল করবে।

দ্বিতীয় সমস্যার ব্যাপারে এ কথা বলা যেতে পারে যে, কোন কোন মুসলিম দেশে ইনকাম ট্যাক্সের হার অবৈধ এবং ন্যায়সঙ্গত নয়। ইসলামী ব্যাংকসমূহ এবং তাদের সকল গ্রাহকদের উচিত প্রশাসনকে বুঝানোর চেষ্টা করা এবং ঐসব নীতিমালা পরিবর্তনের ব্যাপারে মেহনত-প্রচেষ্টা করা যা ইসলামী ব্যাংকের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। প্রশাসনেরও এ বিষয়টি বুঝা উচিত যে, ইনকাম ট্যাক্সের হার যদি যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত হয়, তাহলে রাজস্ব আয় কমবে না বরং বৃদ্ধি হবে এবং ট্যাক্স উসূলকারীদেরও বুঝাতে হবে যে, সততার সাথে ট্যাক্স আদায়ে তাদেরও লাভ রয়েছে।

# ক্ষীয়মান অংশীদারিত্ব (Diminishing Musharakah)

মুশারাকার আরেকটি পদ্ধতি যাকে সাম্প্রতিককালে প্রসারিত করা হয়েছে। তাহল "ক্ষীয়মান অংশীদারিত্ব"[১]। এই পদ্ধতি অনুযায়ী অর্থায়নকারী এবং তার গ্রাহক কোন যমীন, আসবাবপত্র কিংবা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের যৌথ মালিকানা লাভ করে, অর্থায়নকারীর অংশ বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্ত করা হয় এবং একথা পরিজ্ঞাত থাকে যে, গ্রাহক অর্থায়নকারীর অংশের ইউনিটসমূহ ক্রমান্বয়ে এক এক করে ক্রয় করতে থাকবে। এক একটি ইউনিট ক্রয়ের ফলে অর্থায়নকারীর অংশ কম হতে থাকবে। এক পর্যায়ে গ্রাহক অর্থায়নকারীর সমুদয় অংশ ক্রয় করে ফেলবে এবং যমীন কিংবা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের এককভাবে মালিক হয়ে যাবে।

ক্ষীয়মান অংশীদারিত্বের এই পদ্ধতিকে বিভিন্ন লেনদেনে বিভিন্নভাবে অবলম্বন করা যায়। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে।

(১) এই পদ্ধতিকে ব্যাপকভাবে হাউজ ফিন্যান্সিং (গৃহ নির্মান অর্থায়ন)-এর জন্য ব্যবহার করা যায়। গ্রাহক একটি বাড়ি ক্রয় করতে ইচ্ছুক, কিন্তু তার নিকট বাড়ি ক্রয় করার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা বিদ্যমান নেই। এমতাবস্থায় গ্রাহক অর্থায়নকারীর স্মরণাপন্ন হয়, ফলে অর্থায়নকারী বাড়ি ক্রয়ে গ্রাহকের সাথে অংশীদারিত্বের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে যায়। বাড়ির মুল্যের (২০%) বিশ পার্সেন্ট গ্রাহক পরিশোধ করে এবং (৮০%) আশি পার্সেন্ট পরিশোধ করে অর্থায়নকারী। সুতরাং বাড়ির আশি পার্সেন্টের মালিক অর্থায়নকারী এবং বিশ পার্সেন্টের মালিক

---

১. অর্থাৎ ক্রমশ হ্রাসের ভিত্তিতে অংশীদারিত্ব।

গ্রাহক। বাড়ি যৌথভাবে ক্রয়ের পর গ্রাহক বাড়িকে তার বসবাসের প্রয়োজনে ব্যবহার করে এবং অর্থায়নকারীকে তার অংশ ব্যবহার করার কারণে ভাড়া প্রদান করে। এর সাথে সাথে অর্থায়নকারীর অংশকে সমান আটটি ইউনিটে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি ইউনিট বাড়ির দশ পার্সেন্ট মালিকানার প্রতিনিধিত্ব করে। (কেননা তার পূর্ণ মালিকানা ছিল আশি পার্সেন্ট)। গ্রাহক অর্থায়নকারীর সাথে এই অঙ্গীকার করে যে, প্রত্যেক তিন মাস পর পর একটি ইউনিট ক্রয় করবে। সুতরাং তিন মাসের প্রথম মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর সে বাড়ির মূল্যের দশ পার্সেন্ট পরিশোধ করে একটি ইউনিট ক্রয় করে নেয়। এর দ্বারা অর্থায়নকারীর অংশ আশি পার্সেন্ট থেকে হ্রাস পেয়ে সত্তর পার্সেন্ট হয়ে যাবে। এই অনুপাতে অর্থায়নকারীকে পরিশোধ্য ভাড়াও কম হতে থাকবে। দ্বিতীয় মেয়াদ পূর্ণ হলে গ্রাহক আরেকটি ইউনিট ক্রয় করে নিবে। যার ফলে বাড়িতে তার অংশ বৃদ্ধি পেয়ে চল্লিশ পার্সেন্ট এবং অর্থায়নকারীর অংশ হ্রাস পেয়ে ষাট পার্সেন্ট হয়ে যাবে। আর সেই অনুপাতে ভাড়াও কম হয়ে যাবে। এভাবে এই ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে, এমনকি দু'বছর সমাপ্তির পর গ্রাহক অর্থায়নকারীর সমুদয় অংশ ক্রয় করে নিবে, যার ফলে তার অংশ শেষ হয়ে যাবে এবং গ্রাহকের অংশ একশ' পার্সেন্ট হয়ে যাবে।

এই পদ্ধতি অর্থায়নকারীকে এ অনুমতি প্রদান করে যে, বাড়িতে তার মালিকানা অনুপাতে ভাড়ার দাবী করতে পারবে এবং সাথে সাথে স্বীয় অংশের ইউনিটসমূহ বিক্রি করে আসল পুঁজি ক্রমান্বয়ে ফেরত নিয়ে নিতে পারবে।

(২) "ক" যাত্রীদেরকে ভ্রমণ সেবা প্রদানের জন্য একটি গাড়ি ক্রয় করতে ইচ্ছুক, যাতে যাত্রীদের থেকে গৃহীত ভাড়া দ্বারা আয় উপার্জন করতে পারে। কিন্তু তার নিকট সেই পরিমাণ ফান্ড নেই। এমতাবস্থায় "খ" গাড়ির ক্রয়ে অংশীদারিত্বের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। ফলে তারা উভয়ে যৌথভাবে একটি গাড়ি ক্রয় করে নেয়। ৮০% মূল্য "খ" পরিশোধ করে এবং ২০% মূল্য "ক" পরিশোধ করে। অতঃপর এই গাড়িটি যাত্রীদের ভ্রমণ সেবার কাজে নিয়োজিত করা হয়। এর থেকে দৈনিক ১০০০/= টাকা আয় হয়। যেহেতু গাড়িতে "খ"-এর অংশ ৮০%, সেহেতু এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করে নেয়া হয়েছে যে, ভাড়ার ৮০% "খ" পাবে এবং ২০% "ক" পাবে, গাড়িতে তার অংশও ২০%। এর অর্থ হল এই যে, দৈনিক ৮০০/= টাকা "খ" এবং ২০০/= টাকা "ক" পাবে। তিন মাস পর "ক" "খ"এর অংশ থেকে একটি ইউনিট ক্রয় করে নিয়েছে। যার ফলে "খ" এর অংশ কমে ৭০% এবং "ক" এর অংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩০% হয়ে গিয়েছে। যার অর্থ এটা হল যে, ঐ তারিখ হতে "ক" দৈনিক আয় থেকে ৩০০/= টাকা এবং "খ" ৭০০/= টাকার পাওনাদার হব। এ পদ্ধতি চলতে থাকবে, এমনকি দু'বছর সমাপ্তির পর গাড়ি সম্পূর্ণভাবে "ক" এর মালিকানায় হয়ে যাবে, "খ" উল্লেখিত নিয়মানুযায়ী আয়ের স্বীয় অংশ এবং তার আসল পুঁজিও ফেরত পেয়ে যাবে।

(৩) "ক" রেডিমেট গার্মেন্টসের ব্যবসা শুরু করতে চায়, কিন্তু তার কাছে ঐ ব্যবসার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা বিদ্যমান নেই। এমতাবস্থায় "খ" একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ যথা- দু'বছরের জন্য তার সাথে অংশীদারিত্বের ব্যাপারে রাজী হয়ে যায়। চল্লিশ পার্সেন্ট পুঁজি বিনিয়োগ করে "ক" এবং ষাট পার্সেন্ট বিনিয়োগ করে "খ"। উভয়ে মুশারাকার ভিত্তিতে ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে এবং মুনাফার হারও সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে নিয়েছে। এর সাথে সাথে ব্যবসায় "খ" এর অংশকে সমান ছয়টি ইউনিট বানানো হয় এবং "ক" ধীরে ধীরে তা ক্রয় করা শুরু করে দেয়। এমনকি দু'বছরান্তে "খ" ব্যবসা থেকে বের হয়ে যায় এবং "ক" ব্যবসার একক মালিক হয়ে যায়। "খ" বিভিন্ন মেয়াদে মুনাফা পাওয়া ছাড়াও স্বীয় ইউনিটসমূহের মূল্যও পেয়ে যাবে। যা মূলত তার আসল পুঁজি ফেরত পাওয়ার সদৃশ্য।

শরীয়তের দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এই পদ্ধতিসমূহ বিভিন্ন লেনদেনের সমষ্টি। যা বিভিন্ন পর্যায়ে স্বীয় দায়িত্ব আদায় করে। এ জন্য ক্ষীয়মান অংশীদারিত্বের উপরোল্লিখিত তিনটি উদাহরণ সম্পর্কে ইসলামী মূলনীতির ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

## ক্ষীয়মান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে হাউজ ফিন্যান্সিং

প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে নিম্নল্লোখিত বিষয়সমূহ রয়েছে।

১. বাড়িতে যৌথ মালিকানা সৃষ্টি করা। (শিরকাতুল মিলক)

২. অর্থায়নকারীর অংশ গ্রাহককে ভাড়ায় প্রদান করা।

৩. অর্থায়নকারী ক্লায়েন্ট (গ্রাহক) থেকে তার অংশ ক্রয়ের অঙ্গীকার নেয়া।

৪. বিভিন্ন ধাপে বাস্তবে তার ইউনিটসমূহ ক্রয় করা।

৫. বাড়িতে অর্থায়নকারীর অবশিষ্টাংশ অনুপাতে ভাড়া নির্ধারণ।

এ পর্যায়ে আমরা এই পদ্ধতির বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা করব।

(১) উল্লেখিত পদ্ধতিতে প্রথম ধাপ বাড়িতে যৌথ মালিকানা সৃষ্টি করা। এ বিষয়টি এ অধ্যায়ের শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শিরকাতুল মিলক বিভিন্ন পদ্ধতিতে অস্তিত্বে আসতে পারে। যার মধ্যে উভয়পক্ষের যৌথভাবে ক্রয় করাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ পদ্ধতিকে সকল ফিক্‌হবিদগণ সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ বলে সাব্যস্ত করেছেন[১]। তাই এভাবে যৌথ মালিকানা সৃষ্টি করার ব্যাপারে কোন অভিযোগ হতে পারে না।

(২) এই পদ্ধতির দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে অর্থায়নকারী তার স্বীয় অংশ গ্রাহককে ভাড়ায় (Lease) প্রদান করে এবং এর বিনিময়ে তার থেকে ভাড়া উসূল করে। এই পদ্ধতিও সম্পূর্ণ বৈধ। কেননা, কোন ব্যক্তির কোন যৌথ সম্পত্তিতে স্বীয় অবণ্টিত অংশ অপর অংশীদারকে ভাড়ায় প্রদান করার বৈধতার ব্যাপারে ফিক্‌হবিদদের মাঝে কোন মতভেদ নেই। যদি অবণ্টিত অংশ তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে ভাড়ায় প্রদান করে, তার বৈধতার ব্যাপারে ফিক্‌হবিদদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এবং ইমাম যুফার (রহ.) এর মতে অবণ্টিত অংশ তৃতীয় কোন

১. রাদ্দুল মুখতার, খণ্ড ৩য়, পৃষ্ঠা নং- ৩৬৪, ৩৬৫।



ব্যক্তির নিকট ভাড়ায় প্রদান করা যাবে না। অপরদিকে ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু ইউসূফ এবং মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (রহ.) বলেন যে, অবণ্টিত অংশও তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট ভাড়ায় প্রদান করা যেতে পারে। কিন্তু এই এ পদ্ধতিটির সম্পর্ক যতটুকু যে, যৌথ সম্পত্তিকে যদি স্বীয় অপর অংশীদারের নিকট-ই ভাড়ায় প্রদান করা হয়, তাহলে এই ভাড়ার বৈধতার ব্যাপারে সকল ফিক্‌হবিদ একমত।

(৩) উপরোল্লেখিত পদ্ধতির তৃতীয় ধাপ হল, গ্রাহক অর্থায়নকারীর অবণ্টিত অংশের বিভিন্ন ইউনিটসমূহ ক্রয় করতে থাকে। এটাও শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। যদি অবণ্টিত অংশ যমীন এবং বিল্ডিং উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তাহলে উভয়টির বিক্রি সকল ফিক্‌হবিদের নিকট বৈধ। এমনিভাবে যদি বিল্ডিং-এর অবণ্টিত অংশ নিজের অপর অংশীদারের নিকট বিক্রি করার ইচ্ছা করে, তাহলে এটাও ফিক্‌হবিদদের সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ। তবে তা যদি তৃতীয় কোন পার্টির নিকট বিক্রি করে, তাহলে এ ব্যাপারে ফিক্‌হবিদদের মতভেদ রয়েছে।

এইমাত্র বর্ণিত তিনটি দফা (মৌলনীতি) দ্বারা প্রতিভাত হয়েছে যে, উপরোল্লেখিত তিনটি বিষয় সত্তাগতভাবে বৈধ। কিন্তু এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, তিনটি বিষয়কে একই ব্যবস্থাপনায় একত্রীকরণ বৈধ কি না। এর উত্তর হল, যদি তিনটি বিষয়কে এই হিসেবে একত্র করা হয় যে, তাদের প্রত্যেকটি অপরটির জন্য শর্তস্বরূপ হয়ে যায়, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা বৈধ নয়। কেননা, ইসলামের আইনগত পদ্ধতিতে এই উসূল অবধারিত যে, একটি লেনদেনকে অপরটির জন্য পূর্বশর্তস্বরূপ বানানো যায় না। কিন্তু প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে এ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে যে, দু'টি লেনদেনের একটিকে অপরটির জন্য শর্তস্বরূপ বনানোর পরিবর্তে শুধুমাত্র গ্রাহকের পক্ষ থেকে এক তরফা অঙ্গীকার হতে হবে। প্রথম অঙ্গীকার এ কথার যে, গ্রাহক অর্থায়নকারীর অংশকে ভাড়ায় (Lease) গ্রহণ করে এর ভাড়া পরিশোধ করবে। দ্বিতীয় অঙ্গীকার হল, সে বাড়িতে অর্থায়নকারীর অংশের বিভিন্ন ইউনিটসমূহকে ক্রমান্বয়ে ক্রয় করে নিতে থাকবে। এখন আমরা চতুর্থ বিষয়ের দিকে ফিরে যাচ্ছি, তাহল বিচারের দৃষ্টিতে এ ধরনের অঙ্গীকারের আবশ্যকতার মাসআলা।

(৪) সাধারণত এ ধারণা করা হয় যে, কোন কাজের অঙ্গীকার গ্রহণের দ্বারা অঙ্গীকারকারীর উপর শুধুমাত্র চারিত্রিক দায়িত্ব অর্পিত হয়, সেই অঙ্গীকার আদালতের মাধ্যমে কার্যত পূরণ করানো যায় না। কিন্তু অনেক ফিক্‌হবিদ এমনও রয়েছেন যাদের দৃষ্টিভঙ্গী এই যে, অঙ্গীকার বিচারের দৃষ্টিতেও আবশ্যক হয়ে যায় এবং আদালত অঙ্গীকারকারীকে তার কৃত অঙ্গীকার পূরণের জন্য বাধ্য করতে পারে। বিশেষত ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে[১]। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কয়েকজন মালেকী এবং হানাফী ফিক্‌হবিদদের বরাত দেয়া যায়, যারা বলেন যে, প্রয়োজনের সময় আদালতের মাধ্যমেও অঙ্গীকার পূরণ করানো যেতে পারে। হানাফী ফিক্‌হবিদগণ এই দৃষ্টিভঙ্গীকে একটি বিশেষ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছেন, যাকে (بيع بالوفاء) "বাইবিল ওফা" বলা হয়। "বাইবিল ওফা" কোন বাড়ির ক্রয়-বিক্রির একটি বিশেষ পদ্ধতি। যে পদ্ধতিতে ক্রেতা বিক্রেতার সাথে এ অঙ্গীকার করে যে, বিক্রেতা যখন ক্রেতাকে বাড়ির মূল্য ফেরৎ দিয়ে দিবে, ক্রেতা তখন উক্ত বাড়ি পুনরায় বিক্রি করে দিবে। এই পদ্ধতি মধ্য এশিয়ায় প্রচলিত ছিল এবং এ ব্যাপারে হানাফী ফিক্‌হবিদদের দৃষ্টিভঙ্গী এই ছিল যে, যদি বাড়ির দ্বিতীয় ক্রয়-বিক্রয়কে প্রথম ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য শর্ত বনানো হয়ে থাকে তাহলে এটা বৈধ নয়। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয় যদি বিনাশর্তে সংঘটিত হয় এবং ক্রয়-বিক্রয়ের পর ক্রেতা এ মর্মে অঙ্গীকার করে যে, বিক্রেতা যখন তাকে তার ক্রয়মূল্য সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করবে, তখন সে উক্ত বাড়ি পুনরায় তার কাছে বিক্রি করে দিবে। তাহলে এই অঙ্গীকার গ্রহণযোগ্য হবে এবং এর দ্বারা অঙ্গীকারকারীর উপর শুধুমাত্র চারিত্রিক দায়িত্বই অর্পিত হবে না বরং এর দ্বারা প্রকৃত বিক্রেতা আইনগতভাবে অঙ্গীকার পূরণ করানোর একটি অধিকার পেয়ে যাবে[২]।

ফিক্‌হবিদগণ এই পদ্ধতির বৈধতার ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তি এই নীতিমালার উপর রেখেছেন যে, قد تجعل المواعيد لازمة لحاجة الناس

১. ইব্‌ন কুদামা, আল-মুগনী, খণ্ড ৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা নং- ১৩৭ ঃ রাদ্দুল মুখতার, খন্ড ৬ষ্ঠ, পৃষ্ঠা নং- ৪৭,৪৮।

২. রাদ্দুল মুখতার, খণ্ড ৩য়, পৃষ্ঠা নং- ৩৬৫



"প্রয়োজনের সময় অঙ্গীকারকে আদালতের মাধ্যমেও আবশ্যকীয় সাব্যস্ত করা যেতে পারে।" এমনকি অঙ্গীকার যদি ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার পূর্বে গ্রহণ করা হয়, অতঃপর ক্রয়-বিক্রয় বিনাশর্তে সংঘটিত হয়, তাহলে ঐসব ফিক্‌হবিদদের নিকট এমনটি করাও বৈধ হবে[১]।

কেউ কেউ এই প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে যে, অঙ্গীকার যদি কার্যতভাবে ক্রয়-বিক্রয়ে অন্তর্ভুক্তির পূর্বে গ্রহণ করা হয়, তাহলে মূলত এটা স্বয়ং ক্রয়-বিক্রয়ে শর্তারোপ করার সদৃশ্য হয়ে যায়। কেননা উভয় পক্ষের ক্রয়-বিক্রয়ে অন্তর্ভুক্তির সময় এই শর্ত তাদের জানা ছিল, যার কারণে ক্রয়-বিক্রয় যদিও কোন সুস্পষ্ট শর্ত ব্যতীত সংঘটিত হয়েছে, তদুপরি তাকে শর্তযুক্ত মনে করা উচিত। যেহেতু একটি সুস্পষ্ট শর্তের অঙ্গীকার ইতিপূর্বে হয়ে গিয়েছে।

এই প্রশ্নের উত্তর এটা দেয়া যেতে পারে যে, ক্রয়-বিক্রয়কে শর্তযুক্ত করা এবং ক্রয়-বিক্রয়কে শর্তযুক্ত করা ব্যতীত অঙ্গীকার করা এই দু'য়ের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। যদি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সুস্পষ্টভাবে শর্ত উল্লেখ করা হয়, তার অর্থ হবে ক্রয়-বিক্রয় ঐ সময়ই সংঘটিত এবং বাস্তবায়ন হবে যখন অঙ্গীকার পূর্ণ করা হবে। যার ফলে ভবিষ্যতে যদি অঙ্গীকার পূর্ণ না করা হয়, তাহলে এই ক্রয়-বিক্রয় বাতিল বলে সাব্যস্ত হবে। এর দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি ভবিষ্যতের কোন ঘটনার উপর নির্ভরশীল হয়ে যায়, যা সংঘটিত হতেও পারে নাও হতে পারে। ফলে চুক্তিতে অনিশ্চয়তার (ধোঁকার) আশংকা সৃষ্টি হয়ে যায়, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ[২]।

পক্ষান্তরে ক্রয়-বিক্রয় যদি কোন শর্ত ব্যতীত সংঘটিত হয়ে থাকে, কিন্তু কোন এক পক্ষ পৃথকভাবে কোন অঙ্গীকার করে নেয়, তাহলে এ কথা বলা যায় না যে, ক্রয়-বিক্রয় অঙ্গীকার পূরণের উপর নির্ভরশীল কিংবা তার সাথে শর্তযুক্ত ছিল। এই ক্রয়-বিক্রয় যে কোন অবস্থায় সংঘটিত হবে অঙ্গীকারকারী তার অঙ্গীকার পূরণ করুক কিংবা না করুক। এমনকি

১. এই মাসআলার বিস্তারিত আলোচনা "মুরাবাহা"র অধ্যায়ে আসবে।

২. জামিউল ফুসূলিয়্যিন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা নং- ২৩৭ ঃ রাদ্দুল মুখতার, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা নং- ১৩৫।

অঙ্গীকারকারী যদি তার অঙ্গীকার থেকে ফিরে যায় তাহলেও ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হবে। যার সাথে অঙ্গীকার করা হয়েছে বেশির চেয়ে বেশি সে এতটুকু করতে পারে যে, অঙ্গীকারকারীকে আদালতের মাধ্যমে তার অঙ্গীকার পূরণের ব্যাপারে বাধ্য করবে। অঙ্গীকারকারী যদি তার অঙ্গীকার পূর্ণ করার ক্ষমতা না রাখে, তাহলে যার সাথে অঙ্গীকার করা হয়েছিল সে ততটুকু প্রকৃত ক্ষতিপূরণের দাবী করতে পারে যতটুকু তার অঙ্গীকার পূরণ না করার কারণে হয়েছে।

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ক্রয় করার পৃথক অঙ্গীকার আসল চুক্তিকে তার সাথে শর্তযুক্ত কিংবা তার উপর নির্ভরশীল করে না। সুতরাং এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যেতে পারে।

এই পর্যালোচনার ভিত্তিতে "ক্ষীয়মান অংশীদারিত্ব"কে হাউজ ফিন্যান্সিং-এর জন্যে নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(ক) যৌথভাবে ক্রয়, ভাড়া এবং অর্থায়নকারীর অংশের ইউনিটসমূহের ক্রয়-বিক্রয় এসব লেনদেনকে একই চুক্তিতে পরস্পরে মিলানো উচিত নয়। তবে যৌথ ক্রয় এবং ভাড়ার চুক্তিকে একই কাগজে লিখা যাবে। যার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থায়নকারী এ ব্যাপারে একমত পোষণ করবে যে, যৌথ ক্রয়ের পর সে তার অংশ গ্রাহককে ভাড়ার ভিত্তিতে প্রদান করবে। এরূপ করা এজন্য বৈধ (সামনে আসবে) যে, ভাড়া ভবিষ্যতের যেকোন তারিখ থেকেও সংঘটিত পারে। এর সাথে গ্রাহক একতরফা অঙ্গীকারের উপর স্বাক্ষর করতে পারে, যার পরিপ্রেক্ষিতে সে অর্থায়নকারীর অংশের ইউনিটসমূহ নির্দিষ্ট বিরতির পর ক্রয় করে নিবে এবং অর্থায়নকারী একথা স্বীকার করতে পারে যে, গ্রাহক যখন তার অংশের একটি ইউনিট ক্রয় করে নিবে, তখন সে অনুপাতে ভাড়াও কমে যাবে।

(খ) প্রত্যেক ইউনিট ক্রয় করার সময় নতুন করে ইজাব-কবুল (প্রস্তাব দান গ্রহণ)-এর মাধ্যমে সেই নির্দিষ্ট তারিখে ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হতে হবে।



(গ) এটা সর্বোত্তম যে, গ্রাহকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ইউনিটের ক্রয়মূল্য ঐ দিনের বাজারদর অনুযায়ী হওয়া যা ঐ ইউনিট ক্রয় করার দিন বাজারে প্রচলিত থাকে। তবে এটাও জায়েয আছে যে, ক্রয়ের অঙ্গীকারনামায়ও (যার উপর গ্রাহক স্বাক্ষর করেছে) একটি মূল্য ধার্য করে নিতে পারে।

## সেবার (Services) ব্যবসার জন্য ক্ষীয়মান অংশীদারিত্ব

উপরোল্লেখিত ক্ষীয়মান অংশীদারিত্বের দ্বিতীয় উদাহরণ একটি গাড়ি যৌথ ভাবে ক্রয় করা, যাতে গাড়িটি ভ্রমণ সেবার কাজে ভাড়ায় প্রদান করে আয় উপার্জন করা যায়। এই পদ্ধতিটি নিম্নবর্ণিত বিষয়কে শামিল করে।

(১) শিরকাতুল মিল্কের আকৃতিতে গাড়িতে একটি যৌথ মালিকানা সৃষ্টি করা, এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ, যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

(২) গাড়ি দ্বারা সেবা (Service) প্রদানের মাধ্যমে উপার্জিত আয়ে মুশারাকা, এটাও বৈধ, যা এই অধ্যায়ের শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে।

(৩) গ্রাহক অর্থায়নকারীর অংশের বিভিন্ন ইউনিটসমূহ ক্রয় করা। এর বৈধতা ঐসব শর্তের সাথে শর্তযুক্ত যা হাউজ ফিন্যান্সিং-এ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তবে হাউজ ফিন্যান্সিং এবং এই দ্বিতীয় উদাহরণের মাঝে প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। তাহল এই যে, গাড়িকে যখন ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে সেবার কাজে ব্যবহার করা হয়, তখন সাধারণত সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে অবচয়ের কারনে গাড়ির মূল্যও কম (Depreciation) হতে থাকে। এজন্য অর্থায়নকারীর বিভিন্ন ইউনিটসমূহের মূল্য নির্ধারণের সময় গাড়ির যে পরিমাণ মূল্য কমে যায় তা অবশ্যই সামনে রাখা উচিত।

## সাধারণ ব্যবসায় ক্ষীয়মান অংশীদারিত্ব

পূর্বোল্লেখিত উদাহরণসমূহের তৃতীয় উদাহরণ এই ছিল যে, অর্থায়নকারী ৬০% পার্সেন্ট পুঁজি রেডিমেট গার্মেন্টসের ব্যবসা পরিচালনার জন্য বিনিয়োগ করেছে, এই পদ্ধতি দু'টি বিষয়কে শামিল করে।

(১) প্রথম ধাপে এটি একটি সাধাসিধা মুশারাকা, যার মাধ্যমে দু'জন অংশীদার একটি যৌথ ব্যবসায় বিভিন্ন পরিমাণে স্বীয় পুঁজি বিনিয়োগ করে। এটা সুস্পষ্ট যে, এই বিষয় ঐসব শর্তের সাথে বৈধ যা এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই বর্ণনা করা হয়েছে।

(২) গ্রাহক অর্থায়নকারীর অংশের বিভিন্ন ইউনিটসমূহকে ক্রয় করা, যা গ্রাহকের পক্ষ থেকে পৃথক অঙ্গীকারের মাধ্যমে হবে। এই অঙ্গীকার সম্পর্কে শর'য়ী শর্তাবলী সেগুলোই যা হাউজ ফিন্যান্সিং-এর আলোচনায় বর্ণনা করা হয়েছে। তবে উভয়ের মাঝে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। তা এই যে, এই উদাহরণে অর্থায়নকারীর অংশের মূল্য ক্রয়ের অঙ্গীকারনামায় নির্ধারণ করা যায় না। মূল্য যদি মুশারাকায় অন্তর্ভুক্তির সময়ই আগাম নির্ধারণ করে নেয়া হয়, তাহলে কার্যত এর অর্থ এই হবে যে, গ্রাহক অর্থায়নকারীর বিনিয়োগকৃত আসল পুঁজিকে মুনাফাসহ কিংবা মুনাফা ব্যতীত ফেরতের নিশ্চয়তা প্রদান করে দিয়েছে, যা মুশারাকার ক্ষেত্রে শরীয়তের দৃষ্টিতে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এ কারণে গ্রাহক যে ইউনিটসমূহ ক্রয় করবে সেগুলোর মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে অর্থায়নকারীর নিকট দু'টি সুযোগ (Options) রয়েছে। প্রথমটি হল- সে এ মর্মে চুক্তি করে নিবে যে, প্রত্যেক ইউনিট ক্রয়ের সময় ব্যবসার মূল্য ধার্য করে তার ভিত্তিতে সেই ইউনিটসমূহ বিক্রি করা হবে। ব্যবসার মূল্য যদি বেড়ে যায়, তাহলে সেই ইউনিটের মূল্যও বেড়ে যাবে। আর ব্যবসার মূল্য কমে গেলে ইউনিটের মূল্যও কমে যাবে। এই মূল্য ধার্য করা অভিজ্ঞ লোকের মাধ্যমে প্রচলিত রীতি অনুযায়ীও হতে পারে। সেই অভিজ্ঞ লোকদের চিহ্নিত করা অঙ্গীকারে স্বাক্ষরের সময়ও করা যেতে পারে। দ্বিতীয়টি এই যে, অর্থায়নকারী গ্রাহককে সেই ইউনিটসমূহকে যে কোন মূল্যে সম্ভব অন্য কোন লোকের কাছে বিক্রি করে দেয়ার অনুমতি প্রদান করবে। এর সাথে সাথে অর্থায়নকারী স্বয়ং গ্রাহককে একটি বিশেষ মূল্যের প্রস্তাব করবে। তার অর্থ এই হবে যে, সে যদি এর থেকে অধিক মূল্যে বিক্রির কোন গ্রাহক পেয়ে যায় তাহলে সে তা বিক্রি করে দিবে।



যদিও শরীয়তের দৃষ্টিতে উভয় সুযোগ-ই গ্রহণযোগ্য, কিন্তু দ্বিতীয় সুযোগটি অর্থায়নকারীর জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, এর অর্থ একজন নতুন অংশীদারের মুশারাকায় শামিল হওয়া। যার দ্বারা পূর্ণ ব্যবসা প্রভাবিত হবে এবং ক্ষীয়মান অংশীদারিত্বের উদ্দেশ্যও শেষ হয়ে যাবে, যে অনুযায়ী অর্থায়নকারী তার অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়ে ফেরত নিতে চাচ্ছিল। এজন্য ক্ষীয়মান অংশীদারিত্বের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য শুধুমাত্র প্রথম সুযোগ-ই গ্রহণযোগ্য।

# মুরাবাহা

অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান মুরাবাহাকে একটি ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করছে এবং তাদের অধিকাংশ অর্থায়ন কার্যক্রম (Financial Operations) মুরাবাহার ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়ে থাকে। এ কারণেই বর্তমানে এই পরিভাষাটি অর্থনীতির পরিধিতে একটি ব্যাংকিং পদ্ধতি হিসেবে প্রচলিত। অথচ মুরাবাহার প্রকৃত রূপ এই ধারণা থেকে ব্যতিক্রম।

মুরাবাহা মূলত ইসলামী ফিক্‌হের একটি পরিভাষা। এর দ্বারা এক বিশেষ প্রকারের ক্রয়-বিক্রয় উদ্দেশ্য হয়। যার প্রকৃত রূপে অর্থায়নের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। যদি কোন বিক্রেতা তার ক্রেতার সাথে এই চুক্তি করে নেয় যে, সে তাকে একটি নির্দিষ্ট পণ্য নির্দিষ্ট মুনাফার ভিত্তিতে প্রদান করবে, সে মুনাফা ঐ পণ্যের ক্রয় মূল্যের উপর বর্ধিত করা হবে। তাহলে এই ক্রয়-বিক্রয়কে "মুরাবাহা" বলা হয়। মুরাবাহার মূল উপাদান এই যে, বিক্রেতার পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ করতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে, তা ক্রেতাকে অবগত করে তার উপর কিছু মুনাফা সংযোজন করে নেয়া। এই মুনাফা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থের আকৃতিতেও হতে পারে এবং শতকরার ভিত্তিতেও হতে পারে।

মুরাবাহার ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধ নগদেও হতে পারে এবং উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে পরবর্তী যেকোন তারিখেও হতে পারে। এ কারণে মুরাবাহা অপরিহার্যভাবে শুধুমাত্র বাকিতে পরিশোধ (Deffered Payment) করাকেই বুঝায় না। যা সাধারণত ঐ সকল লোকেদের ধারণা যারা ইসলামী ফিক্‌হের ব্যাপারে অধিক জ্ঞান রাখেনা এবং যারা শুধুমাত্র ব্যাংকিং লেনদেনের সুবাদেই মুরাবাহার নাম শুনে থাকে।



মৌলিক ভাবে মুরাবাহা একটি সাধাসিধা ক্রয়-বিক্রয়। যে বৈশিষ্ট্যটি তাকে ক্রয়-বিক্রয় অন্যান্য প্রকারসমূহ থেকে পৃথক করে দেয় তা এই যে, মুরাবাহায় বিক্রেতা সুস্পষ্টভাবে ক্রেতাকে এ কথা বলে দেয় যে, তার কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং ব্যয়ের উপর কি পরিমাণ মুনাফা নিতে চায়। যদি কোন ব্যক্তি ব্যয়ের কথা উল্লেখ করা ব্যতীত কোন জিনিস একটি নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রি করে, তাহলে তা মুরাবাহা হবে না। যদিও সে তার ব্যয়ের উপর মুনাফাও অর্জন করে। কেননা, এই ক্রয়-বিক্রয় ব্যয়ের উপর কিছু অতিরিক্ত সংযোজন ("Cost-Plus") করার উপর ভিত্তি নয়। এ ক্ষেত্রে তাকে "দর কষাকষি" ক্রয়-বিক্রয় বলা হয়।

এটা হল মুরাবাহা পরিভাষার প্রকৃত অর্থ, যা একটি নির্ভেজাল এবং সাধাসিধা ক্রয়-বিক্রয়। কিন্তু অন্যান্য আরো কিছু নিয়ম-নীতি বৃদ্ধি করে একে ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে এধরনের চুক্তি বিশুদ্ধ হওয়া কিছু শর্তের উপর নির্ভরশীল, যেগুলোর প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য, যাতে করে এই চুক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হয়।

এসব শর্তসমূহকে সঠিকভাবে বুঝার জন্য সর্বপ্রথম এ কথা মনে রাখা জরুরী যে, মুরাবাহা সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এক প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়ই। যার কারণে বিশুদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়ের সকল আনুষঙ্গিক বিষয়াবলী তাতে পাওয়া যাওয়া অপরিহার্য। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয়ের কয়েকটি মৌলিক বিধি-বিধান বর্ণনার মাধ্যমে এই আলোচনার সূচনা করা হচ্ছে, যেগুলো ব্যতীত কোন প্রকারের ক্রয়-বিক্রয়ই শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হতে পারে না। এরপর আমরা ঐসব বিধানাবলী সম্পর্কে আলোচনা করব যেগুলো "মুরাবাহা"র সাথে সম্পর্ক রাখে। অতঃপর ব্যাখ্যার দ্বারা এ কথা বর্ণনা করা হবে যে, মুরাবাহাকে গ্রহণযোগ্য অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করার পদ্ধতি কি।

এক্ষেত্রে বিস্তারিত নীতিমালাসমূহকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যে বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে যেন আলোচ্য বিষয়ের মৌলিক সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়ে যায় এবং সূত্র প্রদানে সহজতার জন্য সংরক্ষণ করা যায়।

## ক্রয়-বিক্রয়ের কয়েকটি বিধি-বিধান

ইসলামে ক্রয়-বিক্রয়ের এই সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে যে, "মূল্যবান জিনিসকে মূল্যবান জিনিসের-ই বিনিময়ে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে আদান-প্রদান করা।" মুসলিম ফিক্‌হবিদগণ ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির ব্যাপারে অনেক বিধি-বিধান উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বর্ণনা করার জন্য কয়েক খণ্ডে অনেক গ্রন্থও রচনা করেছেন। এখানে শুধুমাত্র সেসব বিধি-বিধানের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা উদ্দেশ্য যেগুলোর সম্পর্ক বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত মুরাবাহার সাথে রয়েছে।

**বিধান নং-১ ঃ** যে পণ্য বিক্রি করা হবে, বিক্রির সময় তা বিদ্যমান থাকতে হবে। সুতরাং যে পণ্য এখনো অস্তিত্বে আসেনি, তা বিক্রি করা যাবে না। সুতরাং পারস্পরিক সন্তুষ্টিতেও যদি কোন অস্তিত্বহীন পণ্য বিক্রি করা হয়, তাহলে এই বিক্রি শরীয়তের দৃষ্টিতে বাতিল বলে গণ্য হবে।

**যেমন ঃ** "ক" তার গাভীর বাচ্চা যা এখনো জন্ম হয়নি "খ" এর নিকট বিক্রি করছে, এই বিক্রি বাতিল বলে গণ্য হবে।

**বিধান নং-২ ঃ** যে পণ্য বিক্রি করা হবে, বিক্রির সময় তা বিক্রেতার মালিকানায় থাকতে হবে। সুতরাং যে পণ্য বিক্রেতার মালিকানায় নেই তা বিক্রি করা যাবে না। যদি মালিকানা প্রতিষ্ঠার পূর্বে তা বিক্রি করা হয়, তাহলে বিক্রি বাতিল বলে গণ্য হবে।

**যেমন ঃ** "ক" "খ" এর নিকট একটি গাড়ি বিক্রি করছে, যা এখনো "গ" এর মালিকনায় রয়েছে। কিন্তু সে আশাবাদী, গাড়িটি "গ" থেকে ক্রয় করে "খ" এর নিকট হস্তান্তর করে দিবে। যেহেতু গাড়িটি বিক্রির সময় "ক" এর মালিকানায় ছিল না, সেহেতু এই বিক্রি বাতিল বলে গণ্য হবে।

**বিধান নং-৩ ঃ** যে পণ্য বিক্রি করা হবে, বিক্রির সময় তা বিক্রেতার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কব্জায় থাকতে হবে। "পরোক্ষ" কব্জা দ্বারা উদ্দেশ্য এমন অবস্থা, যে অবস্থায় কব্জাকারী উক্ত পণ্য বাহ্যিকভাবে তার অধীনে নেয়নি কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়েছে এবং পণ্যের যাবতীয় দায়-দায়িত্বও তার উপর ন্যস্ত হয়ে গিয়েছে। সেসব দায়-দায়িত্বের মধ্যে উক্ত



পণ্যের ধ্বংসের আশংকা এবং ঝুঁকিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ, এই পণ্য যদি ধ্বংস বা ক্ষতি হয়ে যায়, তাহলে এ কথা মনে করা হবে যে, তা ক্রেতার ক্ষতি হয়েছে।

**যেমন ঃ** (১) "ক" "খ" থেকে একটি গাড়ি ক্রয় করেছে, "খ" এখনো ঐ গাড়িটি "ক" বা তার উকিলের কাছে হস্তান্তর করেনি। এমতাবস্থায় "ক" এই গাড়িটি "গ" এর নিকট বিক্রি করতে পারবে না। যদি সে গাড়িটি কব্জা করার পূর্বে বিক্রি করে দেয়, তাহলে বিক্রি শুদ্ধ হবে না।

(২) "ক" "খ" থেকে একটি গাড়ি ক্রয় করেছে, "খ" ঐ গাড়িটি নির্দিষ্ট এবং চিহ্নিত করার পর তা এমন একটি গ্যারেজে রেখে দিয়েছে, যেখানে "ক" এর স্বাধীনভাবে প্রবেশ করার অনুমতি রয়েছে এবং "খ" তাকে অনুমতি প্রদান করেছে যে, সে গাড়িকে গ্যারেজ থেকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিয়ে যেতে পারবে এ পর্যায়ে গাড়ির দায়ভার "ক" এর উপর ন্যস্ত হয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় গাড়ি "ক" এর পরোক্ষ কব্জায় (Constructive Possession) হয়ে গিয়েছে। সুতরাং এ পর্যায়ে "ক" যদি গাড়ির উপর বাহ্যিক এবং প্রত্যক্ষ কব্জা ব্যতীত "গ" এর নিকট বিক্রি করে দেয়, তাহলে বিক্রি শুদ্ধ হবে।

**ব্যাখ্যা নং-১ ঃ** ১ থেকে ৩ নং বিধানের সারাংশ হল কোন ব্যাক্তি এমন জিনিস বিক্রি করতে পারবে না, যা-

(১) এখনো অস্তিত্বে আসেনি।

(২) বিক্রেতার মালিকানায় নেই।

(৩) বিক্রেতার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কব্জায় নেই।

**ব্যাখ্যা নং-২ ঃ** প্রকৃত বিক্রি (Actual Sale) এবং শুধুমাত্র বিক্রির অঙ্গীকারের মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। প্রকৃত বিক্রি ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত উপরোক্ত তিনটি শর্ত পূর্ণ না করা হয়। তবে কোন ব্যক্তি এমন জিনিসের বিক্রির অঙ্গীকার করতে পারে যা তার মালিকানায় কিংবা কব্জায় নেই। মূলত বিক্রির অঙ্গীকার দ্বারা অঙ্গীকারকারীর উপর শুধুমাত্র চারিত্রিকভাবে তার অঙ্গীকার পূরণের দায়িত্ব অর্পিত হয়। এই অঙ্গীকার পূরণে সাধারণত আদালতের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি

করা যায় না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ করে যখন অঙ্গীকার করার কারণে দ্বিতীয় পক্ষের উপর কিছু দায়-দায়িত্ব অর্পিত হয়ে যায়, তখন এই অঙ্গীকার আদালতের মাধ্যমেও পূরণ করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় আদালত অঙ্গীকারকারীকে তার কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করার ব্যাপারে অর্থাৎ কার্যত বিক্রির জন্য বাধ্য করবে। সে যদি অঙ্গীকার পূরণ করতে না পারে, তাহলে ওয়াদা খেলাফীর কারণে দ্বিতীয় পক্ষের প্রকৃত যে ক্ষতি হয়েছে আদালত অঙ্গীকারকারীকে তা আদায়ের নির্দেশ দিবে[১]। কিন্তু কার্যত বিক্রি সেসময় সংঘটিত হবে যখন উক্ত পণ্য বিক্রেতার কব্জায় আসবে। তখন নতুন করে ইজাব-কবুলের (প্রস্তাব-না ও প্রস্তাব গ্রহণের) প্রয়োজন হবে। যতক্ষন পর্যন্তএভাবে বিক্রি না হবে ততক্ষন পর্যন্ত তার আইনগত ফলাফল কার্যকর হবে না।

### বর্জন ঃ

বিধান নং- ১-৩ এ উল্লেখিত নিয়মে দু'প্রকারের বিক্রি বর্জন করা হয়েছে। (১) বাইয়ে সালাম (২) ইসতিসনা'।

এই উভয় প্রকারের বিক্রি সম্পর্কে সামনে একটি পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

**বিধান নং-৪ ঃ** বিক্রি বিনা শর্তে এবং তাৎক্ষণিকভাবে সংঘটিত হতে হবে। সুতরাং যে বিক্রি ভবিষ্যতের কোন তারিখের সাথে সম্পৃক্ত হবে কিংবা আগত কোন ঘটনার উপর নির্ভরশীল হবে, সে বিক্রি বাতিল বলে গণ্য হবে। উভয়পক্ষ যদি ক্রয়-বিক্রয়কে বিশুদ্ধ করতে চায়, তাহলে তাদেরকে তখন নতুনভাবে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করতে হবে, যখন ভবিষ্যতের সে তারিখ এসে যাবে কিংবা আরোপিত শর্ত পাওয়া যাবে, যার উপর বিক্রি নির্ভরশীল ছিল।

**যেমন ঃ** (১) "ক" পহেলা জানুয়ারী "খ"কে বলল যে, আমি তোমার নিকট আমার গাড়ি পহেলা ফেব্রুয়ারী থেকে বিক্রি করলাম, তাহলে এই

১. اسلامي فقه اكيدمي كي قرارداد نمبر ٢،٣ منظور كرده اجلاس چهارم منعقده كويت ١٤٠٩ھ ، ملاحظة: مجلة مجمع الفقه الاسلامي، شماره: ١٥٩٩/٢،٥



বিক্রি বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা তাকে ভবিষ্যতের একটি তারিখের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

(২) "ক" "খ"কে বলল যে, অমুক পার্টি যদি নির্বাচনে জয়লাভ করে, তাহলে মনে করা হবে আমার গাড়ি তোমার কাছে বিক্রি হয়েছে। এই বিক্রিও বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা, তাকে ভবিষ্যতের একটি ঘটনার উপর নির্ভরশীল করা হয়েছে।

**বিধান নং-৫ ঃ** বিক্রিয় পণ্য মূল্যবান হতে হবে। সুতরাং ব্যবসায়িক প্রথায় যেসব জিনিসের কোন মূল্য নেই, তা বিক্রি করা যাবে না।

**বিধান নং-৬ ঃ** বিক্রিয় পণ্য এমন না হতে হবে, যা শুধুমাত্র হারাম উদ্দেশ্যেই ব্যবহার হয়ে থাকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয় না।

**বিধান নং-৭ ঃ** যে জিনিস বিক্রি করা হচ্ছে, তা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানা থাকতে হবে এবং ক্রেতাকে সে জিনিস সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করতে হবে।

### ব্যাখ্যা নং-৩ ঃ

বিক্রিয় পণ্য নির্ধারণ ইঙ্গিতের মাধ্যমেও হতে পারে এবং এমন বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমেও হতে পারে যার দ্বারা বিক্রিয় পণ্য ঐসব পণ্য থেকে পৃথক হয়ে যায় যেগুলোর বিক্রি উদ্দেশ্য নয়।

**যেমন ঃ** একটি বিল্ডিং, যে বিল্ডিং-এ একই সাইজে নির্মিত কয়েকটি এ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। বিল্ডিং-এর মালিক "ক" "খ"কে বলল যে, "আমি তোমার নিকট এসব এ্যাপার্টমেন্ট থেকে একটি এ্যাপার্টমেন্ট বিক্রি করছি", "খ"ও গ্রহণ করে নিয়েছে, এ বিক্রি ততক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মৌখিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কিংবা সরাসরি ইঙ্গিতের মাধ্যমে একটি এ্যাপার্টমেন্ট নির্দিষ্ট করে না দেয়া হয়।

**বিধান নং-৮ ঃ** বিক্রিত পণ্য ক্রেতার কব্জায় আসা নিশ্চিত হতে হবে। এ কব্জা শুধুমাত্র ঘটনাক্রমের উপর ভিত্তি কিংবা কোন শর্ত পাওয়া যাওয়ার সাথে নির্ভরশীল না হতে হবে।

**যেমন ঃ** "ক" তার এমন একটি গাড়ি বিক্রি করছে, যা কোন অপরিচিত ব্যক্তি চুরি করে নিয়ে গিয়েছে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি এ আশায় ক্রয় করছে যে, "ক" তার গাড়িটি পুনরায় পেয়ে যাবে, এই বিক্রি শুদ্ধ হবে না।

**বিধান নং-৯ ঃ** মূল্য নির্ধারণ করাও বিক্রি শুদ্ধ হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত। মূল্য যদি নির্ধারিত না হয়, তাহলে বিক্রয় শুদ্ধ হবে না।

**যেমন ঃ** "ক" "খ"কে বলল যে, মূল্য এক মাসের মধ্যে পরিশোধ করা হলে পঞ্চাশ টাকা এবং দু'মাসের মধ্যে পরিশোধ করা হলে পঞ্চান্ন টাকা হবে। "খ"ও একথার উপর একমত হয়ে যায়, এক্ষেত্রে মূল্য অনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে বিক্রি শুদ্ধ হবে না। তবে পর্যায়ক্রমিক দু'টি মূল্যের যে কোন একটিকে বিক্রির সময় নির্ধারণ করে নেয়া হলে শুদ্ধ হবে।

**বিধান নং-১০ ঃ** বিক্রিতে কোনরূপ শর্ত থাকতে পারবে না। যে বিক্রিতে কোন শর্তারোপ করা হবে তা ফাসিদ হবে। তবে যে শর্ত ব্যবসায়িক প্রথায় প্রচলিত এবং ব্যবহৃত থাকে তাতে কোন অসুবিধা নেই।

**যেমন ঃ** (১) "ক" "খ" থেকে একটি গাড়ি এ শর্তে ক্রয় করছে যে, সে তার ছেলেকে স্বীয় ফার্মে কর্মচারি হিসেবে রাখবে। এ বিক্রি শর্তযুক্ত হওয়ার কারণে ফাসিদ হয়ে যাবে।

(২) "ক" "খ" থেকে একটি ফ্রিজ এ শর্তে ক্রয় করছে যে, "খ" দু'বছর পর্যন্ত এর ফ্রী সার্ভিস প্রদান করবে। এই শর্তটি যেহেতু এ ধরনের লেনদেনের অংশ হিসেবে পরিচিত, তাই এই শর্তারোপ করা সহীহ আছে এবং বিক্রিও শুদ্ধ হবে।

## বাইয়ে মুয়াজ্জাল
## (মূল্য বাকিতে পরিশোধের ভিত্তিতে বিক্রি)

(১) যে ক্রয়-বিক্রয়ে উভয়পক্ষ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করে যে, মূল্য পরে পরিশোধ করা হবে তাকে "বাইয়ে মুয়াজ্জাল" বলা হয়।

(২) বাইয়ে মুয়াজ্জালও বৈধ তবে শর্ত হল মূল্য পরিশোধের তারিখ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত করে নিতে হবে।



(৩) মূল্য পরিশোধের সময় নির্দিষ্ট তারিখের ভিত্তিতেও নির্ধারণ করা যেতে পারে (যেমন- পহেলা জানুয়ারী পরিশোধ করা হবে) এবং নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতেও হতে পারে, যেমন- তিন মাস পর পরিশোধ করা হবে। কিন্তু মূল্য পরিশোধের সময় ভবিষ্যতের এমন কোন ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট করে নির্ধারণ করা যাবে না যার চূড়ান্ত তারিখ অজ্ঞাত এবং অনিশ্চিত যদি পরিশোধের তারিখ অনির্দিষ্ট কিংবা অনিশ্চিত হয়, তাহলে বিক্রি শুদ্ধ হবে না।

(৪) যদি মূল্য পরিশোধের জন্য একটি বিশেষ সময় নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে, যেমন- এক মাস, তাহলে সময়ের হিসাব ক্রেতা বিক্রয় পন্য হস্তগত করার সময় থেকে শুরু হবে। তবে উভয়পক্ষ যদি অন্য কোন চুক্তির উপর একমত হয়ে থাকে, তাহলে চুক্তি অনুযায়ী শুরু হবে।

(৫) বাকির ক্ষেত্রে মূল্য নগদ অপেক্ষা অধিকও হতে পারে। তবে চুক্তির সময়ই তা নির্ধারণ করতে হবে।

(৬) একবার যে মূল্য নির্ধারিত হয়ে যায়, নির্ধারিত সময়ের পূর্বে পরিশোধের কারণে কিংবা নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বে পরিশোধের কারণে তাতে কম- বেশী করা বৈধ নয়।

(৭) কিস্তি সময়মত পরিশোধের জন্য ক্রেতার উপর চাপ সৃষ্টি করার সুবিধার্থে তাকে এই অঙ্গীকার করার জন্য বলা যেতে পারে যে, সময় মত পরিশোধ না করার ক্ষেত্রে সে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কোন জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য দান করবে, এমতাবস্থায় বিক্রেতা সে অর্থ ক্রেতা থেকে উসূল করতে পারবে কিন্তু নিজের আয়ের অংশ হিসেবে নয় বরং ক্রেতার পক্ষ হতে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার জন্য। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে এই অধ্যায়েই আসবে।

(৮) মূল্য কিস্তিতে পরিশোধের ভিত্তিতে যদি পণ্য বিক্রি করা হয়, তাহলে বিক্রেতা এই শর্তও আরোপ করতে পারে যে, ক্রেতা যদি কোন একটি কিস্তিও সময়মত পরিশোধ না করে, তাহলে অবশিষ্ট সকল কিস্তি তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করা আবশ্যকীয় হয়ে যাবে।

(৯) সময়মত মূল্য পরিশোধ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিক্রেতা ক্রেতা থেকে কোন সিকিউরিটি প্রদানের দাবী করতে পারে, তা বন্ধকের আকৃতিতেও হতে পারে কিংবা অন্য কোন মাধ্যমেও হতে পারে।

(১০) ক্রেতা থেকে প্রমিসরী নোট বা বিনিময় বিল (Bill of exchange) স্বাক্ষরের দাবীও করতে পারে। তবে এই প্রমিসরী নোট বা হুন্ডিকে তৃতীয় কোন ব্যক্তির নিকট তার গায়ে লিখিত মূল্যের চেয়ে কম বা অধিক মূল্যে বিক্রি করতে পারবে না।

## মুরাবাহা

(১) মুরাবাহা ক্রয়-বিক্রয়ের এক বিশেষ প্রকার। যে ক্রয়-বিক্রয়ে বিক্রেতা বিক্রিত পণ্যের ব্যয় সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেয় এবং তার উপর কিছু মুনাফা সংযোজন করে অন্যের নিকট বিক্রি করে।

(২) মুরাবাহায় মুনাফা (Mark Up) নির্ধারণ পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে দু'পন্থার কোন এক পন্থায় করা যেতে পারে। হয়ত নির্দিষ্ট পরিমাণের অংক সাব্যস্ত করে নিবে (যেমন- মূল ব্যয়ের উপর এত টাকা অতিরিক্ত) অথবা মূল ব্যয়ের উপর বিশেষ আনুপাতিক হার সাব্যস্ত করে নিবে (অর্থাৎ- মূল ব্যয়ের উপর এত পার্সেন্ট অতিরিক্ত)।

(৩) বিক্রিত পণ্য সংগ্রহ করতে বিক্রেতার যে পরিমাণ টাকা ব্যয় হয়েছে যেমন- মালের ভাড়া, কাস্টম ডিউটি ইত্যাদি সব কিছু ব্যয়ে সংযোজন হবে এবং মুনাফা (Mark Up) সামগ্রিক ব্যয়ের উপর ধার্য করা হবে। কিন্তু ব্যবসার ঐসব খরচ যা শুধুমাত্র একবার পণ্য সংগ্রহ করতে ব্যয় হয় না, বরং বারংবার হতে থাকে যেমন- কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, বিল্ডিং ভাড়া ইত্যাদি এসব ব্যয়কে একক লেনদেনের ব্যয়ে সংযোজন করা যাবে না। তবে মূল ব্যয়ের উপর যে মুনাফা নির্ধারণ করা হবে তাতে সব ধরনের খরচের প্রতিও লক্ষ্য রাখা যাবে।

(৪) মুরাবাহা ঐ ক্ষেত্রে শুদ্ধ হবে যখন পণ্যের পূর্ণ ব্যয় নির্ধারণ করা যাবে। যদি পণ্যের পূর্ণ ব্যয় নির্ধারণ করা না যায়, তাহলে তাকে মুরাবাহা



হিসেবে বিক্রি করা যাবে না। সে ক্ষেত্রে উক্ত পণ্য দর কষাকষির (Bargaining) ভিত্তিতে বিক্রি করা যাবে। অর্থাৎ- এ ক্ষেত্রে পণ্যের ব্যয় এবং তার উপর নির্ধারিত মুনাফার পরিমাণ ক্রেতাকে জানানো হবে না। এ সময় পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য ধার্য করা হবে।

**যেমন ঃ** (১) "ক" এক জোড়া জুতা একশ' টাকায় ক্রয় করেছে, সে উক্ত জুতা দশ পার্সেন্ট মুনাফার ভিত্তিতে মুরাবাহায় বিক্রি করতে চায়। এখানে মূল ব্যয় যেহেতু পূর্ণভাবে জানা আছে, সেহেতু মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করা শুদ্ধ হবে।

(২) "ক" একই চুক্তিতে একটি রেডিমেট স্যুট এবং এক জোড়া জুতা পাঁচ টাকায় ক্রয় করেছে। এখানে স্যুট এবং জুতা উভয়টি এক সাথে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করতে পারবে। কিন্তু শুধুমাত্র জুতাকে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করতে পারবে না। কেননা, শুধুমাত্র জুতার ব্যয় নির্ধারণ করা যাচ্ছে না। সে যদি শুধুমাত্র জুতাকেই বিক্রি করতে চায়, তাহলে তাকে জুতার ব্যয় এবং তার উপর মুনাফার পরিমাণ ক্রেতাকে বলা ব্যতীত একটি নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রি করতে হবে।

## মুরাবাহা পদ্ধতিতে অর্থায়ন

মূলত মুরাবাহা অর্থায়ন পদ্ধতি নয় বরং ক্রয়-বিক্রয়ের একটি বিশেষ প্রকার। শরীয়তের দৃষ্টিতে অর্থায়নের আদর্শিক পদ্ধতি হচ্ছে মুশারাকা এবং মুদারাবা। যার ব্যাপারে পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান অর্থনৈতিক সেট-আপের দৃষ্টিতে অর্থায়নের কোন কোন অধ্যায়ে মুশারাকা এবং মুদারাবাকে ব্যবহার করার মধ্যে কিছু প্রয়োগিক জটিলতা রয়েছে। যার কারণে এ যুগের অভিজ্ঞ ফিক্‌হবিদগণ বিশেষ কিছু শর্ত সাপেক্ষে বাকিতে পরিশোধের ভিত্তিতে মুরাবাহাকে অর্থায়নের পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে দু'টি মৌলিক বিষয় ভালভাবে জেনে নেয়া জরুরী।

(১) এ কথা মনে রাখা জরুরী যে, মুরাবাহা তার প্রকৃতরূপে অর্থায়ন পদ্ধতি নয়। এটা শুধুমাত্র সুদ থেকে বাঁচার একটি মাধ্যম এবং কৌশল। এটা এমন আদর্শিক অর্থায়ন পদ্ধতি নয়, যা ইসলামের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। এ জন্য অর্থ ব্যবস্থাকে ইসলামী আদর্শে সাজানোর লক্ষ্যে মুরাবাহাকে একটি সাময়িক ধাপ হিসেবে ব্যবহার করা উচিত এবং মুরাবাহার ব্যবহার সেসব ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত যেখানে মুশারাকা এবং মুদারাবাকে প্রয়োগ করা যায় না।

(২) গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় বিষয়টি হল, শুধুমাত্র সুদের স্থলে মুনাফা কিংবা মার্কআপ শব্দ ব্যবহার করলেই মুরাবাহা বাস্তবায়ন হয় না। মূলত শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ মুরাবাহাকে অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে কয়েকটি শর্তের সাথে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত সে সব শর্ত পরিপূর্ণভাবে পালন না করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুরাবাহা বৈধ হবে না। হাকীকত এই যে, সে সব শর্ত পালন করার দ্বারাই সুদী ঋণ এবং মুরাবাহার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যদি সে সব শর্ত পালন না করা হয়, তাহলে এই চুক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ হবে না।

## মুরাবাহা পদ্ধতিতে অর্থায়নের মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

(১) মুরাবাহা সুদভিত্তিক প্রদেয় ঋণ নয়। বরং মুরাবাহা হচ্ছে, মূল্য বাকিতে পরিশোধের ভিত্তিতে কোন পণ্য বিক্রি করা, যার মূল্যে ব্যয় ব্যতীত নির্ধারিত মুনাফাও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(২) মুরাবাহা যেহেতু একটি ক্রয়-বিক্রয়, ঋণ প্রদান করা নয়, সেহেতু তাতে ঐসব শর্ত পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যাওয়া অপরিহার্য, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত। বিশেষ করে সে সব শর্ত যা এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে বর্ণনা করা হয়েছে।

(৩) মুরাবাহাকে অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে শুধুমাত্র তখনই ব্যবহার করা যেতে পারে, যখন বাস্তবিকপক্ষে গ্রাহকের কোন পণ্য ক্রয়ের জন্য ফান্ড-এর প্রয়োজন হবে। যেমন- গ্রাহকের জিনেং ফ্যাক্টরির জন্য কাঁচা মাল



হিসেবে তুলার প্রয়োজন, তখন তার নিকট মুরাবাহার ভিত্তিতে তুলা বিক্রি করা যাবে। কিন্তু যেখানে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ফ্যান্ড-এর প্রয়োজন হয়, যেমন- যেসব মাল পূর্বে ক্রয় করা হয়েছে, সেগুলোর মূল্য পরিশোধ, বিদুৎ বিল কিংবা অন্য বিলসমূহ আদায়, অথবা কর্মচারীদের বেতন-ভাতার জন্য অর্থের প্রয়োজন। এমতাবস্থায় মুরাবাহা প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা, মুরাবাহায় শুধুমাত্র ঋণ প্রদান করা যথেষ্ট হয় না, বরং প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হওয়া অপরিহার্য।

(৪) কোন পণ্য গ্রাহকের নিকট বিক্রির পূর্বে অর্থায়নকারীর তাতে মালিকানা প্রতিষ্ঠা হওয়া অপরিহার্য।

(৫) বিক্রির পূর্বে সে পণ্য অর্থায়নকারীর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কব্জায় থাকতে হবে। অর্থাৎ- সে পণ্য কিছুক্ষণের জন্য চাই তা একেবারে স্বল্প সময়ই হোক না কেন, তার দায়ভারে থাকতে হবে।

(৬) শরীয়তের দৃষ্টিতে মুরাবাহার সর্বোত্তম পদ্ধতি এই যে, অর্থায়নকারী স্বয়ং উক্ত পণ্য ক্রয় করে নিজের কব্জায় নিয়ে নিবে। অথবা এ কাজ তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে উকিল নিয়োগ করে তার মাধ্যমে করাবে। অতঃপর সে পণ্য গ্রাহকের নিকট বিক্রি করবে। তবে যে ক্ষেত্রে কোন কারণে সরবরাহ কারী থেকে সরাসরি ক্রয় করা সম্ভব না হয়, সে ক্ষেত্রে এই অনুমতিও আছে যে, অর্থায়নকারী গ্রাহককে নিজের উকিল হিসেবে নিয়োগ করবে। গ্রাহক অর্থায়নকারীর পক্ষ হতে সে পণ্য ক্রয় করবে। এ ক্ষেত্রে গ্রাহক প্রথমে উক্ত পণ্য অর্থায়নকারীর পক্ষ হতে উকিল হিসেবে ক্রয় করবে এবং তাতে তার প্রতিনিধি হিসেবে কব্জা করবে। অতঃপর তার থেকে বাকি মূল্যে ক্রয় করবে। প্রথম পর্যায়ে উক্ত পণ্যে গ্রাহকের কব্জা অর্থায়নকারীর উকিল হিসেবে হবে। এ সময় পণ্যটি গ্রাহকের কব্জায় শুধুমাত্র আমানত হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে, মালিকানা থাকবে অর্থায়নকারীর। ফলে এর দায়ভারও অর্থায়নকারীর উপরই থাকবে। তবে গ্রাহক যখন অর্থায়নকারী থেকে সে পণ্য ক্রয় করে নিবে, তখন মালিকানা এবং দায়ভার গ্রাহকের দিকে প্রত্যাবর্তন হয়ে যাবে।

(৭) পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন পণ্য বিক্রেতার কব্জায় না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার বিক্রি সঠিক হবে না। কিন্তু সে পণ্য

যদি বিক্রেতার কব্জায় না থাকে, তাহলে বিক্রির অঙ্গীকার করতে পারবে। এই নীতিমালা মুরাবাহায়ও গ্রহণযোগ্য।

(৮) উল্লেখিত নীতিমালাসমূহের আলোকে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিম্ন বর্ণিত প্রক্রিয়া গ্রহণ করে মুরাবাহাকে অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে।

**প্রথম ধাপ ঃ**

আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাহক একটি বহুমুখী চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করবে, যার আলোকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান কাংক্ষিত পণ্যের বিক্রি এবং গ্রাহক উক্ত পণ্য যথাসময়ে একটি নির্ধারিত মুনাফা অনুপাতে ক্রয় করার অঙ্গীকার করবে। চুক্তিনামায় এই ক্রয়-বিক্রয় বাস্তবায়নের সর্বশেষ সময়ও নির্ধারণ করা যেতে পারে।

**দ্বিতীয় ধাপ ঃ**

গ্রাহকের (Client) যখন নির্দিষ্ট পণ্যের প্রয়োজন হবে, তখন আর্থিক প্রতিষ্ঠান সে পণ্য ক্রয়ের জন্য গ্রাহককে তার উকিল নিয়োগ করবে। ওকালতির এই চুক্তিনামায় উভয়পক্ষের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

**তৃতীয় ধাপ ঃ**

গ্রাহক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে সে পণ্য ক্রয় করবে এবং প্রতিষ্ঠানের উকিল হিসেবে তা কব্জা করবে।

**চতুর্থ ধাপ ঃ**

গ্রাহক প্রতিষ্ঠানকে পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারে অবগত করবে এবং সে পণ্য তার থেকে ক্রয় করার প্রস্তাব করবে।

**পঞ্চম ধাপ ঃ**

আর্থিক প্রতিষ্ঠান সে প্রস্তাব গ্রহণ করবে, তাতে ক্রয়-বিক্রয় পূর্ণ হয়ে যাবে। যার ফলে উক্ত পণ্যের মালিকানা এবং দায়ভার উভয়টি গ্রাহকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে যাবে।



সঠিক মুরাবাহার জন্য এই পাঁচটি ধাপ অপরিহার্য। আর্থিক প্রতিষ্ঠান যদি সে পণ্য সরবরাহকারী (Supplier) থেকে সরাসরি ক্রয় করে নেয় (এবং এটাই সর্বোত্তম) তাহলে ওকালতি চুক্তির প্রয়োজন থাকবে না। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ধাপ থাকবে না। তৃতীয় ধাপে আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্বয়ং সাপ্লাইকারী থেকে ক্রয় করবে এবং চতুর্থ ধাপে শুধুমাত্র গ্রাহকের পক্ষ হতে প্রস্তাব হবে।

এই চুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই, যে পণ্যে মুরাবাহা হচ্ছে, সে পণ্য তৃতীয় এবং পঞ্চম ধাপের মধ্যবর্তী সময়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি এবং দায়ভারে থাকে।

এই একটি বৈশিষ্ট্য, যা মুরাবাহাকে সুদি ঋণ থেকে ভিন্ন করে দেয়, এ জন্য প্রত্যেক মূল্যে তার প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য। নচেৎ মুরাবাহা চুক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক হবে না।

(৯) মুরাবাহা সঠিক হওয়ার জন্য এটাও জরুরী যে, সে পণ্য তৃতীয় কোন পার্টি থেকে ক্রয়কৃত হতে হবে। পণ্যটি স্বয়ং গ্রাহক থেকে buy back এর ভিত্তিতে ক্রয় করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। কেননা, বাই ব্যাক-এর ভিত্তিতে মুরাবাহা সুদভিত্তিক ঋণ-ই।

(১০) মুরাবাহার উল্লেখিত প্রক্রিয়া একটি জটিল চুক্তি, যে চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষ এক এক ধাপে এক এক রূপ ধারণ করে।

(ক) প্রথম ধাপে আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাহক ভবিষ্যতে কোন পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে অঙ্গীকার করে, এটা প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয় নয়। এটা শুধুমাত্র ভবিষ্যতে মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রির একটি অঙ্গীকার। এ জন্য উভয়ের মাঝে অঙ্গীকারকারী (promisor) এবং অঙ্গীকার গ্রহণকারীর (promisee) সম্পর্ক হয়।

(খ) দ্বিতীয় ধাপে উভয়পক্ষের মাঝে মক্কেল এবং উকিলের সম্পর্ক হয়।

(গ) তৃতীয় ধাপে আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সরবরাহকারীর (supplier) মাঝে বিক্রেতা এবং ক্রেতার সম্পর্ক হয়।

(ঘ) চতুর্থ এবং পঞ্চম ধাপে গ্রাহক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাঝে বিক্রেতা এবং ক্রেতার সম্পর্ক শুরু হয়ে যায়। বিক্রি যেহেতু বাকি মূল্যে হচ্ছে, সেহেতু বিক্রির সাথে সাথে ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহিতার সম্পর্কও শুরু হয়ে যায়।

এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং সেগুলোর যথা সময়ে স্বীয় পরিণামের সাথে বাস্তবায়ন হওয়া জরুরী। এ বিষয়গুলো পরস্পরে বিমিশ্রিত ও তালগোল পাকানো অবস্থা সৃষ্টি না হওয়া উচিত।

(১১) মূল্য সময়মত পরিশোধের আশ্বস্ততার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহক থেকে কোন ধরনের জামানতের দাবীও করতে পারবে। সে বিল অফ একচেঞ্জ কিংবা প্রমিসরী নোটে স্বাক্ষরেরও দাবী করতে পারবে। কিন্তু এ দাবী তখন করতে পারবে, যখন কার্যত ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন হয়ে যাবে। অর্থাৎ- পঞ্চম ধাপে। তার কারণ হল, প্রমিসরী নোটে স্বাক্ষর ঋণগ্রহিতা ঋণদাতার অধিকারের উপর করে। আর আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাহকের মাঝে এ সম্পর্ক পঞ্চম ধাপেই বাস্তবায়ন হয়, যখন কার্যত ক্রয়-বিক্রয় অস্তিত্বে এসে যায়।

(১২) ক্রেতা যদি সময়মত মূল্য পরিশোধ করতে না পারে, তাহলে এ কারণে মূল্যে বৃদ্ধি করা যাবে না। তবে ক্রেতা এ চুক্তি করেছিল যে, সে এক্ষেত্রে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে অর্থ প্রদান করবে, তাই এ অর্থ পরিশোধ করা তার কর্তব্য হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে বাইয়ে মুয়াজ্জালের বিধি-বিধান বর্ণনা করার সময় ৭ নং বিধানে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ক্রেতা থেকে গ্রহণকৃত এই অর্থ অর্থায়নকারী কিংবা বিক্রেতা তাদের আয়ের অংশ বানাতে পারবে না। বরং তাদের কর্তব্য হবে সে অর্থ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা। এ ব্যাপারে আরো বিশদ বর্ণনা সামনে আসবে।

## মুরাবাহা সম্পর্কে কয়েকটি আলোচনা

মুরাবাহার মৌলিক ধারণা সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পর যথাযোগ্য মনে হচ্ছে যে, মুরাবাহায় ঘটমান কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসাআলার উপর



ইসলামী নীতিমালা এবং তা আমলযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করা। কেননা এসব মাসআলাকে সঠিকভাবে বুঝা ব্যতীত মুরাবাহার ধারণা অস্পষ্ট থেকে যায় এবং প্রয়োগক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে।

### (১) বাকি এবং নগদের জন্য পৃথক পৃথক মূল্য নির্ধারণ করা

মুরাবাহা সম্পর্কে সর্বপ্রথম প্রশ্ন হল, যখন মুরাবাহাকে অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তখন বিক্রি সর্বদা বাকি মূল্যে হয়। অর্থায়নকারী কাংক্ষিত পণ্য নগদ মূল্যে ক্রয় করে এবং তার গ্রাহকের নিকট বাকিতে বিক্রি করে। বাকিতে বিক্রির ক্ষেত্রে যতদিন পর গ্রাহক মূল্য পরিশোধ করে, সে সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখা হয় এবং সে অনুপাতে অর্থায়নকারী মূল্যও বৃদ্ধি করে দেয়। মুরাবাহার পরিপক্বতার সময় (মূল্য পরিশোধের তারিখ) যত বেশি হবে মূল্যও তত বেশি হবে। এ কারণে ইসলামী ব্যাংকসমূহে মুরাবাহায় পণ্যের মূল্য বাজারদর অপেক্ষা বেশি হয়। গ্রাহক যদি সেই পণ্যটি বাজার থেকে নগদ মূল্যে ক্রয় করত, তাহলে মুরাবাহার বাকি মূল্যের থেকে অধিক সস্তায় পেত। এখন প্রশ্ন হল, বাকি বিক্রয়ে কোন জিনিসের মূল্য নগদ মূল্যের তুলনায় অধিক ধার্য করা যাবে কি না। কেউ কেউ বলেন ক্রেতাকে প্রদেয় অবকাশের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাকি মূল্যে যে অতিরিক্ত সংযোজন করা হয় তাকে ঋণের উপর গৃহীত সুদেরই সাদৃশ্য মনে করা উচিত। কেননা, উভয় অবস্থায় অতিরিক্ত অর্থ বাকিতে মূল্য পরিশোধ হওয়ার কারণে গ্রহণ করা হয়। এই যুক্তির ভিত্তিতে তারা বলেন যে, ইসলামী ব্যাংকসমূহে মুরাবাহার উপর যেভাবে আমল হচ্ছে, তা মূলত আধুনিক ব্যাংকসমূহের সুদি ঋণ থেকে ভিন্ন নয়।

এই যুক্তিটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে যৌক্তিক মনে হলেও মূলত তা শরীয়তে সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার উসূলের ভুল বুঝাবুঝির উপর নির্ভরশীল। ব্যাপারটি সঠিকভাবে বুঝার জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো মনে রাখা জরুরী।

(১) আধুনিক পুঁজিবাদি দৃষ্টিভঙ্গী ব্যবসায়িক লেনদেনে পণ্য এবং মুদ্রার (নগদ টাকার) মাঝে কোন পার্থক্য করে না। পারস্পরিক লেনদেনে

পণ্য এবং মুদ্রার সাথে সমান আচরণ করা হয়। উভয়টিই ব্যবসাযোগ্য, উভয়টিরই ক্রয়-বিক্রয় ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মতিক্রমে যে কোন মূল্যে হতে পারে। কোন ব্যক্তি এক ডলারকে দু'ডলারের বিনিময়ে নগদ বা বাকিতে এমনিভাবে বিক্রি করতে পারে যেমনিভাবে এক ডলার মূল্যের কোন পণ্যকে দু'ডলারের বিনিময়ে বিক্রি করতে পারে। শর্ত শুধু উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে হওয়া।

ইসলামী নীতিমালা এই দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন করে না। ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী মুদ্রা (নগদ টাকা) এবং পণ্যের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ কারণে এগুলোর উপর আহকামও পৃথক পৃথক প্রয়োগ করা হয়। মুদ্রা (Money) এবং পণ্যের (Commodity) মাঝে পার্থক্যের মৌলিক বিষয়গুলো নিম্নে বর্ণিত হচ্ছে।

(১) মুদ্রার নিজস্ব কোন ভ্যালু নেই। এর দ্বারা সরাসরি মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা যায় না। এগুলোকে শুধুমাত্র পণ্য এবং সেবা অর্জনের জন্য ব্যবহার করা হয়। পক্ষান্তরে পণ্যের নিজস্ব ভ্যালু রয়েছে। এগুলোকে অন্য কোন জিনিসে রূপান্তরিত করা ব্যতীত সরাসরিও এর দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়।

(২) পণ্য মানদণ্ড এবং গুণগত দিক থেকে বিভিন্ন রকমের হতে পারে। পক্ষান্তরে মুদ্রা শুধুমাত্র মূল্য নির্ধারণ এবং আদান-প্রদানের মাধ্যম। এজন্যই মুদ্রার যে কোন মূল্যমানের একটি একক তার আরেকটি এককের একশ' পার্সেন্ট সমান। পাঁচশ টাকার পুরাতন এবং ময়লাযুক্ত একটি নোট পাঁচশ টাকার নতুন আরেকটি নোটের একশ' পার্সেন্ট সমতুল্য। অথচ পণ্য বিভিন্ন মানদণ্ডের হতে পারে। একটি ব্যবহৃত পুরাতন গাড়ির মূল্য একটি নতুন গাড়ির মূল্য অপেক্ষা অনেক কম হয়।

(৩) পণ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি একটি নির্দিষ্ট জিনিসের উপর হয় অথবা কমপক্ষে সে জিনিসের গুণাগুণ নির্দিষ্ট হয়। (যেমন এমন ধরনের গম)। 'ক' যদি একটি নির্দিষ্ট গাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে তা ক্রয় করে এবং বিক্রেতাও তাতে একমত পোষণ করে, তাহলে সেই গাড়িটি গ্রহণে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। বিক্রেতা এর স্থলে অন্য কোন গাড়ি নেয়ার জন্য তাকে বাধ্য করতে পারবে না। যদিও অন্য গাড়িটি সেই জাতীয় এবং একই মানদণ্ডের হয়। এরকম শুধু তখন হতে পারে যখন ক্রেতাও এব্যাপারে একমত পোষণ করবে। যার প্রয়োগিক অর্থ হবে এই যে, প্রথম ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বাতিল হয়ে গিয়েছে এবং পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে নতুন ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়েছে।



পক্ষান্তরে মুদ্রা কোন আদান-প্রদানের লেনদেনে নির্দিষ্ট করা যায় না। "ক" যদি "খ" থেকে কোন জিনিস তাকে পাঁচশ টাকার একটি নির্দিষ্ট নোট দেখিয়ে ক্রয় করে, তাহলেও সে উক্ত নোটের স্থলে সেই মূল্যমানের অন্য নোট প্রদান করতে পারবে। বিক্রেতা তাকে এ কথার উপর বাধ্য করতে পারবে না যে, সে শুধুমাত্র সেই নোটটিই নিবে, যা বিক্রির সময় তাকে দেখানো হয়েছিল।

এসব পার্থক্যকে সামনে রেখে ইসলাম মুদ্রা এবং পণ্যের সাথে পৃথক পৃথক আচরণ করে। মুদ্রার যেহেতু নিজস্ব কোন ভ্যালু নেই, সে শুধুমাত্র আদান-প্রদানের মাধ্যম, যার মানদণ্ড এবং গুণগত দিক বলতে কিছুই নেই। সেজন্য মুদ্রার একটি একক সেই মূল্যমানের আরেকটি এককের বিনিময়ে আদান-প্রদান শুধুমাত্র সমান সমান এর ক্ষেত্রে-ই হতে পারে। যদি পাকিস্তানী এক হাজার টাকার একটি নোটের আদান-প্রদান পাকিস্তানী আরেকটি নোটের বিনিময়ে করা হয়, তাহলে দ্বিতীয় নোটটিও এক হাজার টাকার-ই হতে হবে। তার মূল্যমান এক হাজার টাকা থেকে কমবেশি হতে পারবে না। যদি ও ক্রয়-বিক্রয় নগদ হোক না কেন। কেননা, কারেন্সি নোটের না নিজস্ব কোন ভ্যালু আছে এবং না তার যা শরীয়ত সমর্থিত কোয়ালিটিগত কোন পার্থক্য আছে। এ কারণে যে কোন দিকে যে কোন মূল্যমান অতিরিক্ত হবে তা বিনিময় বিহীন হবে, ফলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয হবে। যখন উভয় দিকে মুদ্রার লেন-দেন হবে তখন বিষয়টি যেমনিভাবে নগদ ক্রয়-বিক্রয়ের উপর প্রযোজ্য হয়, তেমনিভাবে বাকি ক্রয়-বিক্রয়ের উপরও প্রযোজ্য হবে। কেননা, টাকার আদান-প্রদান টাকার বিনিময়ে বাকিতে করার সময় যদি একদিক থেকে অতিরিক্ত অর্থ নেয়া হয়, তাহলে তা শুধুমাত্র বাকির সময় এবং মেয়াদের বিনিময়েই হবে।

সাধারণ পণ্যে অবস্থা এর চেয়ে ভিন্নরূপ। কেননা, পণ্যের নিজস্ব ভ্যালু রয়েছে এবং পণ্যের মানদণ্ডেও পার্থক্য হয়ে থাকে। এজন্য মালিকের এই অধিকারও রয়েছে যে, চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধি অনুযায়ী যে কোন মূল্যে বিক্রি করতে পারবে। বিক্রেতা যদি কোন ধরনের প্রতারণা এবং মিথ্যা বর্ণনা না করে, তাহলে সে ক্রেতার সম্মতিক্রমে পণ্যকে বাজারদরের চেয়ে অধিক মূল্যেও বিক্রি করতে পারবে। ক্রেতা যদি সেই অতিরিক্ত মূল্যে সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে বিক্রেতার জন্য এই অতিরিক্ত অর্থও একেবারে বৈধ হবে[১]। যখন নগদ সওদায় পণ্য অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করতে পারে, তাহলে বাকি সওদার ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ করতে পারবে। শর্ত শুধু এই যে, বিক্রেতা ক্রেতাকে কোন ধরনের ধোঁকা দিতে পারবে না এবং ক্রেতাকে সেই পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারে বাধ্যও করতে পারবে না। বরং সে এই পরিমাণ মূল্য প্রদানে স্বীয় স্বাধীন সন্তুষ্টিতে একমত হতে হবে।

কোন কোন সময় একথা বলা হয় যে, ক্রয়-বিক্রয় নগদ হওয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মূল্য বাকিতে আদায়ের উপর নির্ভরশীল নয়, তাই এর তো অনুমতি হওয়া উচিত। কিন্তু যেখানে ক্রয়-বিক্রয় বাকিতে হয় সেখানে অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন একমাত্র সময়ের বিনিময়ে হয়, যার কারণে তাকে সুদেরই সাদৃশ্য করে দেয়। কিন্তু এই যুক্তিও সেই ভ্রান্ত ধারণার উপর নির্ভরশীল যে, যেখানেই পরিশোধের সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন করা হয়, সেই লেনদেন সুদের আওতার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এই ধারণা করাই সঠিক নয়। বাকিতে পরিশোধের বিনিময়ে গৃহীত অতিরিক্ত পরিমাণ তখনই সুদ হবে, যখন উভয়দিক থেকে চুক্তি মুদ্রার উপর হবে। কিন্তু যদি পণ্যকে মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করা হয়, তাহলে বিক্রেতা মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে কয়েকটি দিককে সামনে রাখে। যার মধ্যে পরিশোধের সময়ও অন্তর্ভুক্ত থাকে। এজন্য সে অতিরিক্ত মূল্যও চাইতে পারে এবং ক্রেতা বিভিন্ন কারণের ভিত্তিতে তার সাথে একমত পোষণ করতে পারে।

---

১. যেহেতু সেই সমুদয় অর্থ বিক্রিত পণ্যের বিনিময়ে এবং তার কোন অংশও বিনিময় বিহীন নয়।



(ক) যে ক্রেতা মার্কেট কিছুটা দূরে হওয়ার কারণে মার্কেটে যেতে চায় না, বিক্রেতার দোকান সেই ক্রেতার খুব নিকটবর্তী।

(খ) ক্রেতার দৃষ্টিতে এই বিক্রেতা অন্যদের তুলনায় অধিক বিশ্বস্ত এবং ক্রেতা বিক্রেতার উপর এ ব্যাপারে অধিক আশ্বস্ত যে, সে তাকে তার কাংক্ষিত বস্তু নির্ভেজাল সরবরাহ করবে।

(গ) যে সব জিনিসের চাহিদা বেশি হয় (এ জন্য তা অপ্রতুল ও হয়ে যায়) সে সব জিনিস বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতা এই ক্রেতাকে প্রাধান্য দেয়, যার কারণে এই ক্রেতাও তার থেকে ক্রয় করা পছন্দ করে, যাতে ঐ জিনিস বাজারে স্বল্প হলেও তা পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে।

(ঘ) এর দোকানের পরিবেশ অন্যান্য দোকানের তুলনায় অধিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং আরামদায়ক।

বিক্রেতা গ্রাহক থেকে অধিক মূল্য গ্রহণের জন্য এ জাতীয় আরো অন্যান্য বিষয় স্বীয় কৌশল হিসেবে অবলম্বন করে। এমনিভাবে যদি কোন বিক্রেতা তার গ্রাহক থেকে অতিরিক্ত মূল্য এ জন্য গ্রহণ করে যে, সে তাকে বাকির সুযোগ প্রদান করছে, তাহলে তাও শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয হবে না। তবে শর্ত হল সে ধোঁকা দিতে পারবে না এবং ক্রেতা সে পণ্য স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে গ্রহণ করতে হবে। কেননা, মূল্যে অতিরিক্তের কারণ যাই হোক না কেন, সম্পূর্ণ মূল্য ঐ জিনিসের বিনিময়েই হয় মুদ্রার বিনিময়ে নয়। একথা সঠিক যে, মূল্য নির্ধারণ করার সময় সে পরিশোধের সময়কে লক্ষ্য রেখেছে। কিন্তু যখন মূল্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে, তখন এই মূল্য উক্ত পণ্যের দিকেই অর্পিত হবে, সময়ের দিকে নয়। একারণেই ক্রেতা যদি নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করতে না পারে, তাহলে মূল্য সেই পরিমাণেই থাকে, বিক্রেতা পরিমান বৃদ্ধি করতে পারে না। মূল্য যদি সময়ের বিনিময়ে হত, তাহলে বিক্রেতা যখন তাকে অতিরিক্ত সময় দেয়, তখন সে মূল্যও বৃদ্ধি করতে পারতো।[১]

---

১. সার কথা হল এই যে, মূল্য এ জন্য বৃদ্ধি করা হয় যে, গ্রাহকের এই ব্যক্তি থেকে ক্রয়ের ব্যাপারে আগ্রহ এবং চাহিদা বেশি থাকে, এই আগ্রহের বিভিন্ন কারণ হতে পারে।

অন্যভাবে এটাও বলা যেতে পারে যে, টাকার আদান-প্রদান যেহেতু শুধুমাত্র সমান সমান হলেই হতে পারে, এজন্য পূর্ব বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী ক্রয়-বিক্রয় বাকি হওয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ যে পরিমাণই নেয়া হবে (যখন টাকাকে টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা হবে ) তা শুধুমাত্র সময়ের বিনিময়েই হবে। এ কারণেই সুদি পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময় আসার পর ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে অতিরিক্ত সময়ের সুযোগ প্রদান করে তার থেকে অতিরিক্ত অর্থও গ্রহণ করে নেয়। পক্ষান্তরে একটি বাকি ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্য নির্ধারণে সময় একক উপাদান নয়, মূল্য সেই জিনিসের বিনিময়েই ধার্য করা হয়, সময়ের বিনিময়ে নয়। তদুপরি পূর্বোল্লেখিত অন্যান্য উপাদানের ন্যায় সময়ও মূল্য নির্ধারণে আংশিক সংযোজনের কাজ করেছে, কিন্তু এই উপাদান যখন একবার তার কাজ আদায় করে ফেলেছে, তখন মূল্যের প্রত্যেক অংশ সেই জিনিসের দিকেই অর্পিত হবে[১]।

এসব আলোচনার সারাংশ এই যে, যখন টাকার বিনিময়ে টাকার লেনদেন করা হবে, তখন ক্রয়-বিক্রয় নগদ হোক কিংবা বাকি হোক কোন অবস্থায়ই কম-বেশি করা জায়েয হবে না। কিন্তু যখন টাকার বিনিময়ে কোন পণ্য বিক্রি করা হবে, ক্রয়-বিক্রয় নগদ হোক কিংবা বাকি হোক, তখন উভয়পক্ষের মাঝে নির্ধারিত মূল্য বাজারমূল্য অপেক্ষা বেশিও হতে পারবে। পরিশোধের সময়ের ব্যবধান, মূল্য নির্ধারণে একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় এবং তা পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে। টাকার বিনিময়ে টাকার লেনদেনের মত নয়, কেননা এক্ষেত্রে অতিরিক্ত টাকা শুধুমাত্র সময়ের ব্যবধানের বিনিময়েই হয়ে থাকে।

এই মাসআলাটি চার মাযহাবের ইমামগণের নিকট সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য। তাঁরা বলেন যে, বিক্রেতা যদি কোন জিনিসের নগদ এবং কোনরূপ বাকি বিক্রির জন্য পৃথক পৃথক দু'টি মূল্য নির্ধারণ করে এবং বাকি বিক্রির মূল্য নগদ মূল্য অপেক্ষা বেশি হয়, তাহলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে। শর্ত শুধু এই যে, চুক্তির সময়ই সওদা নগদ হবে না

১. সার কথা হল, বেশির চেয়ে এ কথা বলা যেতে পারে যে, এটা সময়ের বিনিময়ে পরোক্ষভাবে প্রত্যক্ষভাবে নয়।



বাকি হবে, দু'টির যে কোন একটিকে নির্ধারণ করে নিতে হবে। তাতে অস্পষ্টতা বিদ্যমান থাকতে পারবে না। উদারহরণস্বরূপ ক্রয়-বিক্রয়ে দর কষাকষির (Bargaining) সময় বিক্রেতা ক্রেতাকে বলল, তুমি যদি এই জিনিস নগদ মূল্যে ক্রয় কর, তাহলে একশ' টাকা, আর যদি ছয় মাসের বাকিতে ক্রয় কর, তাহলে মূল্য হবে একশ' দশ টাকা। কিন্তু ক্রেতাকে দু'টির যে কোন একটিকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত তখনই গ্রহণ করতে হবে। যেমন সে বলল, এই জিনিস বাকি মূল্যে একশ' দশ টাকায় ক্রয় করেছে, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনের সময় মূল্য উভয়পক্ষের মাঝে নির্ধারিত থাকে।

কিন্তু দু'টির যে কোন একটিকে যদি সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট না করা হয়, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সঠিক হবে না। এমনটি কিস্তিতে পরিশোধের ঐসব ক্রয়-বিক্রয়ও সম্ভব, যেখানে পরিশোধের সময় পৃথক পৃথক হওয়ার কারণে পৃথক পৃথক মূল্যের দাবী করা হয়। তখন বিক্রেতা পরিশোধের সিডিউল হিসেবে মূল্যের একটি সিডিউল তৈরি করে। যেমন তিন মাস বাকির ক্ষেত্রে এক হাজার টাকা নেয়া হবে, ছয় মাস বাকির ক্ষেত্রে এগারশ' টাকা, নয় মাস বাকির ক্ষেত্রে বারশ' টাকা ইত্যাদি। এমতাবস্থায়, ক্রেতা তিনটির কোন একটিকে গ্রহণ করবে তা নির্ধারিত করা ব্যতীত সে জিনিসটি নিয়ে নেয়। আর মনে মনে ভাবে যে, ভবিষ্যতে পরিশোধ নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী করবে। (অর্থাৎ যদি তিন মাসে পরিশোধ সম্ভব হয়, তাহলে এক হাজার টাকা দিবে আর যদি ছয় মাসে সম্ভব হয়, তাহলে এগারশ' টাকা দিবে) এই চুক্তি সঠিক হবে না[১]। কেননা, মূল্য এবং পরিশোধের সময় উভয়টি অজানা, কিন্তু সে যদি যে কোন একটিকে সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে নেয়, যেমন সে বলল-এই জিনিসটি ছয় মাসের বাকিতে এগারশ' টাকায় ক্রয় করেছে, তাহলে ক্রয়-বিক্রয় সঠিক হবে।

এখানে আরেকটি কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, উপরে যে পদ্ধতির বৈধতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাহল এই যে, নগদ ক্রয়-বিক্রয়

১. ইবন কুদামা, আল-মুগনী ৪/২৯০, আস্‌সারাখসী, আল-মাবসূত ১৩/৮, আদ্‌দুসূকী, ৩/৮৫, মুগনীল মুহতাজ, ২/৩১।

অপেক্ষা বাকি ক্রয়-বিক্রয় মূল্য অধিক ধার্য করা যাবে। তবে বিক্রি যদি নগদই হয়ে থাকে, কিন্তু বিক্রেতা এই শর্তারোপ করে দেয় যে, ক্রেতা যদি মূল্য পরিশোধে বিলম্ব করে, তাহলে সে বার্ষিক দশ পার্সেন্ট অতিরিক্ত জরিমানা হিসেবে কিংবা সুদ হিসেবে গ্রহণ করবে, তাহলে এটা নিশ্চিতরূপে নাজায়েয। কেননা, এখন যে অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করা হচ্ছে, তা ঋণের উপর গৃহীত সুদ ছাড়া কিছুই নয়[১]।

উভয় পদ্ধতির মাঝে প্রয়োগিক পার্থক্য এই, যেখানে অতিরিক্ত টাকা পণ্যের মূল্যেরই একটি অংশ হবে, সেখানে এই অতিরিক্ত টাকা একবারেই উসূল করা হবে, দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয়বারে নয়। ক্রেতা যদি সময়মত পরিশোধ না করে, তাহলে একারণে বিক্রেতা অতিরিক্ত টাকার দাবী করতে পারবে না, বরং মূল্য ততটুকুই থাকবে। পক্ষান্তরে যেখানে বাজারমূল্যের উপর অতিরিক্ত টাকা পণ্যের মূল্যের অংশ হয় না, সেখানে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে এই অতিরিক্ত টাকা বাড়তে থাকবে।

### (২) প্রচলিত সুদের হারকে নমুনা বানানো

মুরাবাহার মাধ্যমে অর্থায়নকারী অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের মুনাফার নির্ধারণ প্রচলিত সুদের হারের ভিত্তিতে করে থাকে। যার জন্য সাধারণত LIBOR[২] অর্থাৎ লন্ডনে ব্যাংকসমূহের পারস্পরিক সুদের হারকে নমুনা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেমন, LIBOR যদি ছয় পার্সেন্ট

---

১. এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ক্রয়-বিক্রয় যদি নগদ কিংবা বাকির কোন উল্লেখ না থাকে, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে সেই বিক্রিকে নগদই মনে করা হবে এবং বিক্রেতা যখন ইচ্ছা মূল্য দাবী করতে পারবে।

২. কোন কোন ব্যাংকের কাছে প্রয়োজনাতিরিক্ত নগদ অর্থ থাকে এবং কোন কোন ব্যাংকের কাছে ঋণ প্রদানের জন্য অর্থ কম থাকে, এ ধরনের ব্যাংক প্রথম ধরনের ব্যাংক হতে সাধারণত ঋণ গ্রহণ করে, এর দ্বারা ব্যাংকসমূহের পারস্পরিক মার্কেট অস্তিত্বে আসে, এই মার্কেটে বিশেষ কোন মেয়াদের জন্য যে হারে সুদ নির্ধারণ করা হয়, তাকে Inter-Bank Market Offered Rate বলা হয়। যার সংক্ষিপ্ত হল "IBOR"। লন্ডনে ব্যাংকসমূহের মার্কেটের এ ধরনের সুদের হারকে London Inter-Bank Market Offered Rate বলা হয়। যার সংক্ষিপ্ত হল "LIBOR"। ঋণের আদান-প্রদানে এর নাম খুব বেশি আসে।



হয়, তাহলে এই ব্যাংক তার মুনাফা ছয় পার্সেন্ট কিংবা তার চেয়ে কিছু বেশি ধার্য করে নেয়। এই পদ্ধতির উপরও এই অভিযোগ করা হয় যে, যে মুনাফা সুদের হারের উপর নির্ভরশীল হবে, তাও সুদের ন্যায় হারাম হওয়া উচিত।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হালাল মুনাফা নির্ধারণের জন্য সুদের হারকে ব্যবহার করা অপছন্দনীয় এবং এর দ্বারা এই লেনদেন কমপক্ষে বাহ্যিকভাবে হলেও সুদি ঋণের সাদৃশ্য হয়ে যায়। আর সুদ কঠোরভাবে হারাম হওয়ার দাবি হল এই বাহ্যিক সাদৃশ্যতা থেকেও যথাসম্ভব বেঁচে থাকা উচিত। কিন্তু এই বাস্তবতাও ভুলবার নয় যে, মুরাবাহা সঠিক হওয়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবি এই যে, তা একটি প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয় হতে হবে যেখানে ক্রয়-বিক্রয়ের সকল আনুষঙ্গিক বিষয় পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায়। যদি কোন মুরাবাহায় পূর্ব বর্ণিত সেই সব শর্ত পাওয়া যায়, তাহলে শুধুমাত্র মুনাফা নির্ধারণের জন্য সুদের হারকে নমুনা হিসেবে ব্যবহার করার দ্বারা এই চুক্তি অশুদ্ধ এবং হারাম হয়ে যাবে না। কেননা, লেনদেন মূলত সুদের উপর নয়, সুদের হারকে তো শুধুমাত্র নমুনা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এ কথাটি একটি উদাহরণের দ্বারা বুঝা যেতে পারে।

"ক" এবং "খ" দু'ভাই। "ক" মদের ব্যবসা করে, যা একেবারে হারাম। "খ" একজন আল্লাহওয়ালা মুসলমান, তাই সে এই ব্যবসাকে পছন্দ করে না। এজন্য সে নেশাবিহীন হালাল পানীয়-এর ব্যবসা শুরু করেছে। কিন্তু সে চায়, তার ব্যবসায়ও সে পরিমাণ মুনাফা হোক, যে পরিমাণ অন্য ভাই মদের ব্যবসায় অর্জন করে। এ জন্য সে মনস্থির করেছে যে, সে তার গ্রাহকদের থেকে ঐ অনুপাতে মুনাফা নিবে, যে অনুপাতে "ক" মদের উপর নেয়। তাহলে সে তার মুনাফার অনুপাতকে "ক" এর নাজায়েয ব্যবসার মুনাফার সাথে সম্পৃক্ত করে নিয়েছে। কোন ব্যক্তি এমন করাটাকে পছন্দ হওয়া বা না হওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করতে পারে, কিন্তু এ কথা সুস্পষ্ট যে, কেউ এ কথা বলতে পারবে না, এই বৈধ ব্যবসা থেকে উপার্জিত মুনাফা হারাম। কেননা, সে মদের মুনাফাকে শুধুমাত্র নমুনা হিসেবে ব্যবহার করেছে।

এমনিভাবে মুরাবাহা যদি ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে হয়ে থাকে এবং তার অপরিহার্য শর্তসমূহও পূরণ করা হয়, তাহলে মুনাফার হারকে প্রচলিত সুদের হারের নমুনায় নির্ধারণ করার দ্বারা এই চুক্তি নাজায়েয হবে না।

তবে এ কথা সত্য যে, ইসলামী ব্যাংকসমূহ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য যত দ্রুত সম্ভব এই পদ্ধতি থেকে নিস্কৃতি লাভ করা উচিত। কেননা, প্রথমত এতে সুদের হারকে বৈধ ব্যবসার জন্য আদর্শ এবং মানদণ্ড মনে করা হয়, যা অপছন্দনীয়। দ্বিতীয়ত এর দ্বারা ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক দর্শনের অগ্রগতি ও উন্নয়নে চরমোৎকর্ষণ সাধিত হয় না। কেননা, এর দ্বারা সম্পদ বণ্টন নীতিতে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করে না। এজন্য ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উচিত তারা যেন তাদের মানদণ্ড এবং নমুনা গঠন করে। এর একটি পদ্ধতি এটা হতে পারে যে, ইসলামী ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে তাদের ইন্টার ব্যাংক মার্কেট গঠন করবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি যৌথ শাখা বানানো যেতে পারে, যা প্রকৃত সম্পদের ভিত্তিতে আদান-প্রদান যোগ্য ডকুমেন্টে পুঁজি বিনিয়োগ করবে। যেমন, মুশারাকা, ইজারা ইত্যাদি। যদি সেই শাখার সম্পদ জড় পদার্থ আকৃতির হয় যেমন ইজারাকৃত সম্পদ (Lease) সম্পদ, আসবাবপত্র এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের অংশসমূহ। তাহলে এই শাখার ইউনিটসমূহের ক্রয়-বিক্রয় তার সম্পদের প্রকৃত মূলধনের ভিত্তিতে হতে পারে। যা ধীরে ধীরে নির্ধারণ করা যাবে। এই ইউনিট আদান-প্রদানযোগ্য হবে এবং সেগুলোকে তাৎক্ষণিক এবং সাময়িক অর্থায়নের (Overnight Finance) জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। যেসব ব্যাংক-এর নিকট প্রয়োজনাতিরিক্ত তারল্য (Liquidity) থাকবে, তারা সেসব ইউনিটসমূহকে ক্রয় করতে পারবে এবং তাদের যখন দ্বিতীয়বার তারল্য অর্জনের প্রয়োজন হবে, তখন সেগুলো তারা বিক্রি করতে পারবে। এই ব্যবস্থাপনায় একটি ইন্টার ব্যাংক মার্কেট অস্তিত্বে এসে যাবে এবং ইউনিটসমূহের প্রচলিত মূল্যকে মুরাবাহা ও ইজারায় (Lease) মুনাফা নির্ধারণে নমুনা হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে।



## (৩) ক্রয়ের অঙ্গীকার

বর্তমানে শরীয়ত বিদ্বজ্জনদের মাঝে মুরাবাহা সম্পর্কে আরেকটি আলোচনার বিষয় এই যে, গ্রাহক ফিন্যাসের আবেদ করা মাত্রই ব্যাংক/অর্থায়নকারী ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না কেননা, কাংক্ষিত বস্তু তখন ব্যাংক-এর মালিকানায় থাকে না। যেমন পূর্বে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি এমন জিনিস বিক্রি করতে পারবে না যা তার মালিকানায় নেই এবং এমন জিনিসও বিক্রি করতে পারবে না যা ভবিষ্যতে অস্তিত্ব লাভ করবে (Forward Sale)। সুতরাং তাকে অবশ্যই প্রথমে সে জিনিস সাপ্লাইকারী থেকে ক্রয় করতে হবে। অতঃপর তা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কব্জা করে গ্রাহকের নিকট বিক্রি করবে। ব্যাংক কিংবা অর্থায়নকারী সে জিনিস ক্রয় করার পর গ্রাহক যদি তা ক্রয় করার পাবন্দী না করে, তাহলে অর্থায়নকারী এমন অবস্থারও সম্মুখীন হতে পারে যে, সেই কাংক্ষিত বস্তু সংগ্রহ করার জন্য অনেক ব্যয় বহন করেছে, কিন্তু গ্রাহক তা ক্রয় করতে অস্বীকার করে দিয়েছে। এই বস্তুটি এমন ধরনেরও হতে পারে যে, মার্কেটে তার ব্যাপক চাহিদা নেই এবং তা থেকে নিস্কৃতি পাওয়া কঠিন হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে অর্থায়নকারীর অপূরণীয় হয়ে যেতে পারে।

মুরাবাহার এই সমস্যার সমাধান এইরূপে করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, গ্রাহক (Client) একটি চুক্তির উপর স্বাক্ষর করবে, যার আলোকে সে এই অঙ্গীকার করবে যে, অর্থায়নকারী যখন সেই পণ্য সংগ্রহ করবে, তখন সে তা ক্রয় করবে। দু'তরফা হিসেবে ভবিষ্যতের সাথে সংশ্লিষ্ট বিক্রির (Forward Sale) পরিবর্তে গ্রাহকের পক্ষ থেকে একতরফা ক্রয়ের অঙ্গীকার হবে, যা পালন করার দায়িত্ব গ্রাহকের উপর, অর্থায়নকারীর নয়। এই পদ্ধতি ফরওয়ার্ড সেল থেকে ভিন্ন।

এই সমাধানের উপর আরেকটি প্রশ্ন করা হয় যে, একতরফা অঙ্গীকারের দ্বারা গ্রাহকের উপর শুধুমাত্র চারিত্রিক দায়িত্ব অর্পিত হয়, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে আদালতের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করানো যায় না। এর থেকে আমরা আরেকটি প্রশ্নের দিকে ধাবিত হচ্ছি যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে একতরফা অঙ্গীকার বিচারের দৃষ্টিতেও অপরিহার্য কি না। সাধারণত মনে

করা হয় যে, এটা বিচারের দৃষ্টিতে অপরিহার্য নয়। কিন্তু এ কথাকে বিনাবাক্যব্যয়ে গ্রহণ করার পূর্বে আমরা শরীয়তের মূল উৎসের আলোকে তার পর্যালোচনা করে দেখব।

ইসলামী ফিক্‌হের গ্রন্থাবলীর সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে গভীর অনুসন্ধান করার দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, এই মাসআলায় ফিক্‌হবিদদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে তা উল্লেখ করা হচ্ছে।

(১) অধিকাংশ ফিক্‌হবিদদের মত হল, অঙ্গীকার পূরণ করা একটি উত্তম চরিত্র এবং অঙ্গীকারকারীর তা পূরণ করা উচিত। তা পূরণ না করা ভৎসনা ও তিরস্কার উপযোগী কাজ। কিন্তু তা পূরণ করা অপরিহার্য ও আবশ্যকীয় নয় এবং আদালতের মাধ্যমেও পূরণ করানো যাবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি বর্ণনা করা হয়েছে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফে'য়ী, ইমাম আহমাদ এবং কোন কোন মালেকী ফিক্‌হবিদদের থেকে[১]। তবে সামনে বর্ণনা করা হবে যে, অধিকাংশ হানাফী ও মালেকী ফিক্‌হবিদ এবং কোন কোন শাফে'য়ী ফিক্‌হবিদগণ এই দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে একমত পোষণ করেন না।

(২) অধিকাংশ ফিক্‌হবিদদের মত এই যে, অঙ্গীকার পূরণ করা ওয়াজিব এবং অঙ্গীকারকারীর চারিত্রিক দায়িত্বের সাথে সাথে আইনগত দায়িত্বও হল অঙ্গীকার পূরণ করা। তাদের মাযহাব অনুযায়ী আদালতের মাধ্যমেও অঙ্গীকার পূরণ করানো যাবে। এই মাযহাবটি প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সামুরা ইব্‌ন জুনদুব, উমার ইব্‌ন আব্দিল আজীজ, হাসান বসরী, সায়ীদ ইব্‌নুল আশওয়া, ইসহাক ইব্‌ন রাহ্‌ওয়ায় এবং ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে বর্ণিত।[২] কোন কোন মালেকী ফিক্‌হবিদদের মাযহাবও এটাই। ইবনুল আরাবী এবং ইবনুশ্‌শাত (রহ.) ও এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রসিদ্ধ শাফে'য়ী ফিক্‌হবিদ ইমাম গাযালী (রহ.) ও এর সমর্থন করেছেন।

১. উমদাতুল কারী, ১২/১২, মিরকাতুল মাফাতিহ, ৪/৬৫৩, আল-আযকার লিননববী, ২৮২ পৃষ্ঠা, فتح العلى المالك ১/২৫৪।
২. সহীহুল বুখারী, কিতাবুশ শাহাদাত, باب من أمرها بانجاز الوعد ১/৩৮৬।



ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন, অঙ্গীকার যদি পরিপক্বভাবে করা হয়, তাহলে তা পূরণ করা ওয়াজিব। ইব্‌ন শুবরুমা (রহ.)-এর অভিমতও এটাই।[১]

কোন কোন মালেকী ফিক্‌হবিদ তৃতীয় আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গী পেশ করেছেন। তারা বলেন যে, সাধারণ অবস্থায়তো অঙ্গীকার পূরণ করা (বিচারের দৃষ্টিতে) ওয়াজিব নয়। যদি অঙ্গীকারকারীর অঙ্গীকারের কারণে দ্বিতীয় ব্যক্তির কোনরূপ ব্যয় বহন করতে হয় কিংবা সেই অঙ্গীকারের ভিত্তিতে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে নেয়, তাহলে এধরনের অঙ্গীকার পূরণ করা অপরিহার্য, যা পূরণের জন্য আদালতের মাধ্যমেও চাপ সৃষ্টি করা যাবে।

সমকালীন কোন কোন আলিমের দাবি এই যে, যে সব ফিক্‌হবিদ অঙ্গীকার পূরণ করা ওয়াজিব হওয়াকে সমর্থন করেছেন তা এক তরফা দান কিংবা অন্য কোন জিনিস স্বেচ্ছায় পরিশোধের ব্যাপারে। দু'তরফা ব্যবসায়িক কিংবা আর্থিক চুক্তির অঙ্গীকার সম্পর্কে ঐসব ফিক্‌হবিদ এই ওয়াজিব হওয়াকে সমর্থন করেননি। কিন্তু গভীরভাবে অধ্যয়নের পর এই দৃষ্টিভঙ্গী সঠিক বলে মনে হয় না। কেননা, হানাফী এবং মালেকী ফিক্‌হবিদগণ অঙ্গীকার ওয়াজিব হওয়ার ভিত্তিতে 'বাইউল ওয়াফা'কে বৈধ বলে সাব্যস্ত করেছেন। "বাইউল ওয়াফা" ক্রয়-বিক্রয়ের একটি বিশেষ প্রকার। যার মাধ্যমে কোন স্থাবর সম্পদের ক্রেতা এই অঙ্গীকার করে যে, বিক্রেতা যখন তাকে ঐ সম্পদের মূল্য ফেরত দিয়ে দিবে, তখন সে উক্ত সম্পদকে পুনরায় বিক্রি করে দিবে। বাইউল ওয়াফা বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে প্রথম অধ্যায়ের ক্ষীয়মান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে হাউজ ফিন্যান্সিং-এর ধারণা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। সে আলোচনার সারাংশ এই যে, পুনর্বার ক্রয়কে যদি প্রথম বিক্রির জন্য শর্ত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, তাহলে এই ক্রয়-বিশুদ্ধ হবে না। যদি উভয়পক্ষ প্রথম ক্রয়-বিক্রয়কে নিঃশর্তে করে থাকে, কিন্তু[২] বিক্রেতা

১. আল-কুরতুবী, আল জামে লিআহকামিল কুরআন, ১৮/২৯, حاشية ابن الشاط على فروق القراني ৪/২৪, আল-গাযালী, এহয়াউ উলুমিদ্দীন, ৩/১৩৩, ইব্‌ন হাযাম, আল-মহল্লী, ৮/২৮।
২. الفروق للقراني ৪/২৫, فتح العلى المالك ১/২৫৪।